

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা
স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ
চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের
তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০
টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার
ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/
সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।



স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2590
Email: pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

9748978406

NPS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond



পায়ের তলায় মাটি

এষা দে

কাল রাতে আবার সেই স্বপ্নটা দেখল। আধো অন্ধকার, সব কেমন ছায়া। সেই লোকটা যাকে বার বার দেখে। পরনে ধুতি, গায়ে কী, না পাঞ্জাবি তো নয়, শার্ট মনে হচ্ছে। পিছন থেকে দেখছে তো, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। হেঁট হয়ে কী যেন করছে। বেশ কষ্ট করে। সামনে ঝুঁকে দুটো হাতে কী একটা ধরে মাথার ওপরে তুলল, আবার নামিয়ে আনল। আবার তুলল, নামিয়ে আনল। কী ওটা ধরে আছে? লম্বা হাতল লাগানো চৌকো মতো একটা পাত। কোদাল নাকি। ও, লোকটা মাটি কোপাচ্ছে। কতগুলো ছায়া যেন লোকটাকে ঘিরে রয়েছে। চারিদিকে



ঘন কালো ওগুলো কী? বোপবাড় বোধ হয়। হ্যাঁ, মাঝখানে একফালি খালি জায়গা, যেখানে ছায়াগুলো দাঁড়িয়ে। ওগুলো মানুষ।

অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। প্রতিবার ঠিক এইখানে ঘুমটা ভেঙে যায়। আশ্চর্য! কেন যে বিদ্যুটে স্বপ্নটা বার বার দেখে। কবে সেই ছেলেবেলায় প্রথম দেখেছিল। তারপর অনেক দিন দেখেনি। ইদানীং প্রায়ই দেখছে। যেন শুধু একটা ছবি, দুটো ঘরের মধ্যে প্যাসেজের দেওয়ালে টাঙানো। অতীত আর বর্তমানের মধ্যে যাতায়াতে বার-বার এক বালক চোখে পড়ে। রয়ে সয়ে পুরোটা দেখা কখনোই হয়ে ওঠে না। উফ, বেশ যেমে গিয়েছে। একেই তো আদিকালের পাখায় বেশি স্পিড হয় না, তার ওপর যেটুকু হয় মশারির ভিতর দিয়ে তার কীই-বা পৌঁছয়। জল খাওয়ার জন্য ওঠে। ঘরের ওপাশের তক্তাপোশে মশারির মধ্যে মা ঘুমোচ্ছেন। মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষা বেঁটে আলমারির মাথায় ঢাকা দেওয়া এক গেলাস জল। প্রতিদিনই নিজের জন্য এনে রাখে। সকালে উঠে জলটা খেয়েই তার অফিসের জন্য রেডি হওয়ার পালা শুরু। পশ্চিমবঙ্গে চাকরির যা বাজার। পার্টির কৃপায় কাজটা পেয়েছে। তার মতো রিফিউজি ছেলে-মেয়েদের পার্টিই তো ভরসা।

মা অরুণা দেবী যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এলেন তখন তার বয়স তিন, বড়দির বারো, ছোটদির নয়। উঠলেন শ্যামবাজারে তাঁর সবচেয়ে বড় দাদার কাছে। অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে তাদের মামাবাড়িতে। বড়মামা পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। শখ করে দাদামশাই ঢাকায় নয়, একেবারে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন কলেজে পড়তে। কিন্তু ছেলে পড়া শেষ করতে না করতে তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি। বড়মামা কিন্তু কলকাতায় থেকে গেলেন। বিলিতি মালিকানার একটা সওদাগরি আপিসে কেরানির চাকরি নিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে সংসারে সাহায্য করলেন। ছোট ভাই দুজনের পড়াশোনা, বোনের বিয়ে তো শুধু ক'বিঘে জমির ফসলে হয়নি। তারপর মামা নিজে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আস্তে আস্তে শেষে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে প্রমোশন পেয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন নিজের সংসারটিও। সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, তাঁর মতে, 'সাহেবরাই আমাদের মানুষ করেছে, কী ছিলাম আমরা? ছেলেদের পড়াশোনার দৌড় ক'বছর পাঠশালায় নাম লিখিয়ে শেষ, তারপর ঘরের দু'ফালি জমির অগ্নে কোনোক্রমে টিকে থাকা, জায়গিরদার তালুকদারদের মোসাহেবি করে বেড়ানো, মেয়েগুলোকে ঘরে বসিয়ে রেখে ক'বছর শুধু দুবেলা দুমুঠো খেতে দিয়ে যাকে তাকে ধরে পার। ব্যাস, কর্তব্য শেষ। এখন চণ্ডীমণ্ডপে পরিনিন্দা-পরচর্চা করে, তার পর 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে।' এটা কি একটা মানুষের মতো মানুষের জীবন! তিনি নিজে যেমন ইংরেজের করা

স্কুল-কলেজে পড়ে জীবনে দাঁড়িয়েছেন ছেলে-মেয়েদেরও সেই রাস্তায় চালিত করেছেন। হ্যাঁ, মেয়েকেও পড়িয়েছেন। বিয়েও দিয়েছেন শিক্ষিত এবং চাকুরে দেখে।

কলকাতার বাড়িতে কথাবার্তার ওপর খুব কড়া শাসন চালু ছিল, যা প্রাণ চায় বলবে, একেবারে চলবে না। মামার ভাষায় 'স্পিকটি নট রুলস'। জ্ঞান হতে না হতে অসীম শুনেছে এবং আর সকলের সঙ্গে নিজেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে। যেমন রুল নম্বর ওয়ান, 'দেশ' বা ইস্ট পাকিস্তান সম্পর্কে স্পিকটি নট। তাদের জমিজমা ঘরদোর কী ছিল না ছিল, সেগুলো কী হলো, এ সব সম্পর্কে স্পিকটি নট। দুই, পাকিস্তানে মুসলমান পাড়াপ্রতিবেশীর ব্যবহার সম্পর্কে কোনো কথা নয়, স্পিকটি নট। রুল নং থ্রি, কেন কীভাবে ভারতে এল সে সম্বন্ধে মুখ খোলা একেবারে পুরো নিষেধ, স্পিকটি নট।

বড়ো মামাদের পরিবার পাকিস্তান হওয়ার অনেক আগে থেকে কলকাতায় এসে পড়াশুনো, চাকরিবাকরি, বসবাস করে পুরো এ দেশি হয়ে গিয়েছে। মামাও অনেকটা সেই কারণেই সেখানে বিয়ে করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই কলকাতাতেই স্থায়ী হবেন স্বপ্ন ছিল। চাকরিতে পাকাপাকি হয়ে বসে শ্যামবাজারের আরও উত্তরে বি টি রোডে, সেই যাকে বলে ডানলপ ব্রিজ সেটা ছাড়িয়েই বড়ো রাস্তা থেকে একটু ভিতরে নেমে গিয়ে বেশ খানিকটা জমি সন্তায় কিনে রেখেছিলেন। এত কাল পরে ইদানীং বাড়ি তুলছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে শেষ হলে সবাইকে নিয়ে সেখানেই স্থিত হলেন। তাদের আগমনে মামি আহ্লাদে উথলে ওঠেননি। নিজের বড়ো ছেলেদুটি তত দিনে অবশ্য চাকরিবাকরি- বিয়েথা করে যাকে বলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু বাকি ছোটো ছেলেটা, এখনো কলেজে। এমন সময়ে বাড়তি চার-চারটি মুখের অন্ন জোগানো, আরও তিন জনকে পড়াশোনা শিখিয়ে বড়ো করা, দুটো মেয়ের বিয়েথা দেবার দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে কেই-বা গদগদ হয়।

মা ম্যাট্রিক পাশ হলেও পূর্ববঙ্গের গ্রামের বউ, কলকাতার শহুরে চালে ঝি চাকর নিয়ে সংসারে অভ্যস্ত ছিলেন না। ঘরের সব কাজ বরাবর নিজের হাতেই করে এসেছেন। মামার বাড়িতে পা দিয়েই তাঁর আলাদা নিরামিষ হেঁশেলে বাড়ির বেশিরভাগ রান্নাই করতে থাকেন। চা জলখাবারও। ক'দিন যেতে না যেতেই মামি বললেন, 'ঠাকুরঝি, কলকাতা শহরে অত আমিষ নিরামিষ আলাদা কেউ মানে না। একসঙ্গেই হয়। সবই তো করছ, সঙ্গে একটু মাছের ঝোলটা করে দিতে খুব কি অসুবিধা হবে?' বলাবাহুল্য মা হাসি মুখে বলেছেন, 'না, না সবই করে দেবো খন।' বউদি তুমি নিশ্চিত থাক। শুধু তাই নয়, ঠিকে ঝি কামাই করলে মোটা কাজের ভারটাও মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। 'এত কামাই, একে রাখার কোনো মানে নেই।' পটলার মায়ের ছুটি হয়ে গেল। ঠোঁটকাটা ছোটদা বলতে থাকে, 'পিসি আসায়

মাকে আর কুটোটি নাড়তে হয় না। তার ওপর পটলার মায়ের মাইনেটা বেঁচে গেছে। তার গজগজানিটাও শুনতে হয় না। নিট লাভ। ‘মামি হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে কুটনোটা কুটতে কুটতে চোখ পাকিয়ে শাসন’, তুই কে রে, পুরুষমানুষ সংসারের কাজ নিয়ে ফোঁড়ন কাটতে এসেছিস। যা, নিজের চরকায় তেল দে গে যা।’ সকাল থেকে রাত মুখ বুজে মায়ের কাজ। অবশ্য মুখ বুজে থাকাটা যেন তাঁর স্বভাবই। নিজে থেকে বড়ো একটা কথা তাঁকে বলতে অসীম কখনো শোনেইনি। তাঁর নীরবতার ছোঁয়াচ যেন মেয়েদেরও লেগেছিল। বাড়িতে উঠতি বয়সের দুদুটো মেয়ে আছে কেউ টের পেত না। গলায় তাদের আওয়াজই যেন ফোটে না। স্কুলে পড়াশোনা, বাড়িতে বাকি সময় বাসন মাজা থেকে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, মায়ের সঙ্গে ঘরের যাবতীয় কাজে পুরোদমে হাত লাগানো, ব্যাস, এর বাইরে তাদের আর কিছু নেই। এমনকী একটা মাত্র ভাই, এত ছোটো, তার সঙ্গেও যে তেমন গল্পগুজব খেলাধুলো খুনসুটি কোথায়? আচ্ছা, স্কুলে আর পাঁচটা মেয়েদের দেখে না? তারা নিশ্চয়ই কথাটিখা বলে।

যেমন অসীমের স্কুলের সঙ্গীসাথীরা। প্রথমেই তো প্রশ্ন, ‘হ্যাঁরে, তাদের দেশ কোথায় রে? তখন কি মিথ্যে বলবে নাকি? বাধ্য হয়ে বলে ‘খুলনা, পাকিস্তান।’ ‘ও তোরাও রিফিউজি বুঝি? আমরাও।’ সমীরের পাবনা, জ্যোতির যশোর, মনোজের ময়মনসিং, পরিতোষের ঢাকা, বরেনের সিলেট। বাব্বা, কত জায়গা পাকিস্তানে, কত বড়ো দেশটা। ‘কবে এসেছিস’, ‘তোরা ক’জন এলি’, ‘এখানে কেউ নিজের লোক ছিল’ ইত্যাদি। নিট রেজাল্ট, বড়ো মামার কঠোর স্পিকটি নট রুল সত্ত্বেও অসীম আট ন’ বছর বয়সের মধ্যেই জানতে পেরে গেল ‘দেশ’ মানে চান্দপুরুষের ভিটে থেকে তারা উৎখাত, বিতাড়িত। স্কুলে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে না লেখা থাকলেও বোঝে তারা শুধু নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মতো ছিন্নমূল। তবে বেশিরভাগেরই তাদের মতো কলকাতায় মামা কী জ্যেষ্ঠার বাড়ি ছিল না। খুব কষ্টে ছিল তারা। রিফিউজি কলোনিতে এমনকী শিয়ালদহ স্টেশনে পর্যন্ত দিনের পর দিন কুকুর-বেড়ালের মতো কোনোক্রমে বাঁচতে হয়েছিল। সবাই এক সঙ্গে বা এক সময়েও আসেনি। আশ্চর্য ব্যাপার হলো স্কুলের সমীর, জ্যোতি, মনোজ, পরিতোষ, বরেন, সকলেই বলে পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা বারণ। সব বাড়িতেই কম-বেশি স্পিকটি নট রুল চালু। খালি মুশকিল করে বুড়িগুলো। ঠাকুমা, দিদিমাদের কথায় কথায় ফেলে আসা ভিটের শোক উথলে ওঠে। নাতিপুত্রিরা জানতে পেরে যায় তারা বাধ্য হয়ে চলে এসেছে। দাঙ্গাফাঙ্গা আরও কত কী হয়েছে। পাকিস্তান মানেই যেন একটা গরগরে মারকাটারি রক্ত বয়ে যাওয়া হিন্দি ফিল্ম, যেগুলো দেখা বাড়ি থেকে বারণ এবং তাই সেগুলো দেখার

উদগ্র বাসনা সকলের মনে।

আচ্ছা, তার নাহয় বয়স ছিল মাত্র তিন বছর, কিছু মনে নেই, কিন্তু বড়দি ছোড়দি তো বেশ কিছুটা বড়ো ছিল, তাদের তো অনেক কিছু দেখা, তার ওপর মা, তাঁর তো সব জানার কথা। কতবার জিজ্ঞাসা করেছে ‘মা, আমরা দেশ কেন ছাড়লাম?’ মায়ের সেই এক উত্তর, ‘তোদের বাবা চলে গেলেন। শ্বশুরবাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না। একলা বিধবা তিনটে ছেলে-মেয়ে পাকিস্তানের গ্রামে কী করে মানুষ করব? বাপের বাড়িতে বাকি দাদা দুজনেরই কাজ আসামে—তিনসুকিয়া আর করিমগঞ্জে। তাদের ছেলে-মেয়েরা ছোটো ছোটো, কারও তেমন আহামরি অবস্থা নয়। বড়দা বরাবর পরিবারকে দেখেছেন। তাই কলকাতায় তাঁর কাছেই এসে উঠলাম।’

বড়দি, ছোড়দি মাথা নীচু করে থাকে। মায়ের মুখের দিকে তাকায় না, মা ওদের চোখে চোখ রাখে না। কী রকম অদ্ভুত লাগত অসীমের। প্রথম প্রথম অস্থির হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করত। সেই এক জবাব, এমন কী এক ভাষা পর্যন্ত, একটুও এদিক ওদিক হয় না, যেন মুখস্ত করা পরীক্ষার উত্তর। পাথরে কোঁদা মায়ের মুখ, ভাবলেশহীন। বড়দি ছোড়দি ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে যেত। কখনো কখনো অসীম দিদিদের ধরে পড়ত, ‘এই’ তোরা তো দেখেছিস পাকিস্তানে দাঙ্গা না কী হয়েছিল, বল না, বল না।’ বেশিবার বললে দিদিরা কোরাস গান গাওয়ার মতো এক ভাবে বলত, ‘মায়ের কাছে তো শুনলি।’ মামার স্পিকটি নট রুলে ওদের যেন মুখে বরাবরের মতো তালা চাবি পড়ে গেছে।

অসীম ক্লাস ফোরে উঠতে না উঠতে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেল বাংলাদেশ। পাড়ায় দাদাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ক’মাস ধরে কী উৎসাহ, উদ্দীপনা। যেন একটা লম্বা ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। রেডিওতে ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ প্রোগ্রাম সবাই হাঁ করে শুনল। মা একদিন মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দাদা, এখন কি আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব? জমিজায়গা সব ফেরত পেয়ে সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যাবে?’

মামা উত্তর দিলেন, ‘না রে না। একজন হিন্দুকেও ওরা ফিরতে দেবে না। শুধু নামটাই বদল হয়েছে। লোকগুলো তো সব এক। এই যে মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কলকাতায় সব মাথায় তুলে নাচছে, এ তো ছিল বাঙ্গলার কসাই সুরাবর্দির নাশ্বার ওয়ান চেলা, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় খাস কলকাতায় মুসলিম লিগের লড়াই মেস্বার। তখন ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ জিগির হুঁকে ভারত ভাগ করেছিল এখন ‘জয় বাংলা’ স্লোগান তুলে পাকিস্তান ভাগ করছে। সব ক্ষমতার খেলা, আর কিস্যু নয়।’

স্কুলে ক্রমেই পড়ার চাপ বাড়ে, আর অত পাকিস্তান/বাংলাদেশ নিয়ে ভাবা টাবার সময় থাকে না। রোজ হোমওয়ার্ক

কী দেওয়া হয়েছে, ঠিক মতো করল কিনা, মামার তদারকি করা চাই। অফিস থেকে ফিরেই তাঁর কাজ হলো তিন ভাগনে-ভাগনি এবং ছোটো ছেলেকে নিয়ে বসা। ‘কলেজে হোমওয়ার্ক দেয় না’, বলে ছোড়দা রেহাই পায় না। ‘কেমন ক্লাস করেছিস, কী ক্লাস নোট নিয়েছিস দেখি।’ বড়ো মামার জন্যেই বড়দির মতো ফাঁকিবাজ মেয়েও পাশ করে গেল আর ছোড়দির সেকেন্ড ডিভিশন প্রাপ্তি। ততদিনে কবে ছোড়দা বি-কম পাশ করে গেছে। কিন্তু মামার বড়ো আশা সন্তোষে তাঁর নিজের কোম্পানিতে কাজ হলো না। আসলে সাহেবরা তো স্বাধীনতার পরে দেশে ফিরে গেছে, মালিক এখন মাড়োয়ারি। বাপ সারাজীবন এই কোম্পানিতে কাজ করেছে বলে ছেলেকে সুযোগ দেবে, সে গুড়ে বালি। সখেদে বার বার বলেন, ‘আগেকার দিন হলে, সাহেবরা থাকলে ঠিক আমার ছেলেকে চাকরি দিতেন। ওরা লয়াল্টি, সিইসয়ারিটি ও সবার মূল্য বুঝত।’ বেশ কিছু দিন অ্যাপ্লাই করে করে, ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে শেষমেশ ছোড়দা একটা নুঁয়ে পড়া কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অফিসার হয়েছে, আসলে স্রেফ খাতা লেখা বাবু। মামার সাফ কথা, পুরুষ মানুষ বসে থাকা চলবে না। আরও ভালো কিছু পেলে না হয় ছেড়ে দেবে। বসিয়ে তিনি মেয়েদেরও রাখবেন না। বড়দি সেই বিএ ফেল করল, পড়তে চাইল না, অমনি মামা তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছোড়দি গ্র্যাজুয়েট হলে একটু বেশি ভালো পাত্র জুটল। হ্যাঁ, দু’ দুটো বিয়েতে খরচ তো হবেই। মামির গজগজ, ‘যা কিছু বুড়ো বয়সের সংস্থান ছিল, সব গেল।’ মা আরও সংকুচিত আরও অপরাধী হয়ে গেলেন। এদিকে মেয়েরা আর না থাকায় সংসারের কাজের চাপটা পুরো পড়ল তাঁর একার ঘাড়ে।

অসহ্য লাগে অসীমের। থলি হাতে বাজার-দোকান-হাট করে বটে কিন্তু মায়ের জন্য কিছুই করতে পারে না। যথাসম্ভব বাড়ির বাইরে সময় কাটায়। স্কুলের একেবারে নীচু ক্লাসের ক’টা ছেলেকে পড়িয়ে পকেট খরচটা চলে। কলেজে উঠেই এসএফআইতে যোগ দিয়েছে, দেখনাদেখ সক্রিয় সদস্য। বড়ো মামার চক্ষুশূল এসএফআই, ‘ওটা তো কমিউনিস্টদের নার্সারি ক্লাস। যন্ত সব এই দাবি সেই দাবি, ধর্মঘট আর বনধ্। একেবারে গোপলায় যাচ্ছে দেশটা।’ তাঁর মতে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। পড়াশোনা করতে আবার ইউনিয়ন লাগে নাকি! ভাগ্যে অসীম বাড়িতে এত কম সময় থাকে যে মামার মতো সেকেন্দ্রে পা-চাটা মোসাহেবমার্কী লোকের জ্ঞানদানের এখন বিশেষ সুযোগ মেলে না। ছোড়দা তো চাকুরে মেয়ে বিয়ে করে বাড়িতে এখন দাপিয়ে থাকে, বাবার কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। অতঃপর মামার কর্মজীবনের সমাপ্তি। সরকারি হিসেবে অবসরের বয়স অনেক বছর আগেই হয়ে গিয়েছিল। বেসরকারি সংস্থা বলেই এতকাল পুরো মাইনে দিয়ে কাজে

রেখেছিল। আবার সেই বেসরকারি সংস্থা বলেই পেনশন নেই। এইবার লোকটা যেন পথ চলতে হেঁচট খেল। আর কর্তাসূলভ তেজ নেই, হঠাৎ যেন অন্য মানুষ।

অসীম তখন সদ্য বিএ পাশ করেছে। ইচ্ছা বিএড করে শিক্ষকতা। একদিন বড়ো মামা ডেকে বললেন, ‘বাবা অসীম, তোমরা সবাই জানো আমি পড়াশোনার ভক্ত, চাই ছেলে-মেয়েরা সবাই অনেক পড়ুক। কিন্তু আমার ক্ষমতা তো আর নেই, অমিতা আর অনিতার বিয়েতে বেশ কিছু খরচও হয়ে গেছে। উপার্জন এখন শুধু প্রভিডেন্স ফান্ড, গ্র্যাচুইটির অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ। মিহিররা নিজে থেকে যেটুকু করে, ব্যস। বাকি দুজন তো জানো দূরে থাকে, নিজেদের ছেলেপুলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সেই কুড়ি বছর বয়স থেকে আমি সংসার চালিয়েছি, আজ ছেলেদের কাছে হাত পাতবো তা কি হয়? তবে যা দিন কাল পড়েছে, বাজার তো আগুন। এ অবস্থায় তোমাকে যে বাবা আমি আর পড়াতে পারছি না। কাজকর্মে লাগতে হবে।’



বিএ ডিগ্রিওলা বঙ্গসন্তান ঘরে ঘরে। ওটা কোনো কোয়ালিফিকেশনই নয়। কোথায় চাকরি। ছোটো জামাইবাবুর মেজকাকা সিপিএম করেন, যাগু এম এল এ। পাকিস্তানে তাদের পাশের গ্রামেই নাকি ওঁদের বাড়ি ছিল। জামাইবাবু নিয়ে গেলেন ওঁর কাছে। শহরতলিতে সাধারণ একটা ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে কাগজপত্র ফাইল বোঝাই টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসা আধ ময়লা পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়া সাদামাঠা প্রবীণ এক ভদ্রলোক।

‘তুমি শ্যামলের শালা, সেটা বড়ো কথা নয়, আমার কাছে তুমি অমূল্য স্যারের ছেলে। কী লোক ছিলেন তোমার বাবা, আমাদের স্যার। অত অল্প বয়সে কী তেজ ছিল, কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করেননি। তোমার জন্য ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।’

এই প্রথম অসীম বাবাকে নিয়ে কাউকে কিছু বলতে শুনল। না, ভুল বলল, বড়দির স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হলে এক বার মামা বলেছিলেন, ‘তুই অমূল্যর মেয়ে হয়ে কী করে লেখাপড়ায় এমন হলি? তোর বাবা জানিস কী ভালো ছাত্র ছিল? কত বার বলেছিলাম কলকাতায় চলে আসতে। বলত ‘লেখাপড়া শিখলেই যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, তাহলে দেশটা তো শুধু অশিক্ষিতের হাতেই তুলে দিতে হয়।’ অত অল্প বয়সেই হাই

স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে গিয়েছিল। কী সম্মান ছিল পাঁচটা গাঁয়ে। আর তুই কিনা ফেল করছিস।’ ব্যস, ওই এক দিনই। আর কখনো কারোর মুখে বাবার কথা শোনেনি। কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ কনিষ্ঠ কেরানির চাকরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, জামাইবাবুর মেজকাকার পরামর্শে সব নিয়মকানুন মেনে ১০ টাকার পোস্টাল অর্ডার সহ আবেদন করেছে, লিখিত পরীক্ষায় বসেছে। রেজাল্ট বের হলে আর পাঁচ জনের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়েছে। উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ সুবিধাদান তো সরকারি নীতি। সোজা নিয়োগের চিঠিপত্রাপ্তি।

কাজে জয়েন করল। দেখা গেল ডিপার্টমেন্টে অসীম বয়সে সকলের ছোটো। প্রবীণ বড়বাবু কংগ্রেস আমলের। সম্মেহে বললেন, ‘একেই তো খোকন সোনা, তার ওপর কমরেড এমএলএ-র ক্যান্ডিডেট। কোনো চাপ নেই, বুঝলে। তবে প্রতিদিন দয়া করে একটু দাঁড়ে বস। তাহলেই আমার চোন্দ পুরুষ কেতখ হবেন। ওরে, ভজা নতুন বাবুকে চা বিস্কুট দে। ‘অসীম তাড়াতাড়ি বলে, ‘না না’ চায়ের কোনো দরকার নেই। বাড়ি থেকে এইতো ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। বরং কাজ কী করতে হবে একটু যদি দেখিয়ে দেন।’

‘বাহ, খুব ভালো কথা। জয়ন্ত, একে একটু হাতে খড়ি করাও তো ভাই।’

জয়ন্ত ডিপার্টমেন্টের তালেবর কর্মী, বছর ৩৬/৩৭ বয়স। বড় বাবু, চাকরির সিনিয়ారిটিতে অনেক এগিয়ে এবং সেই হিসেবে মান্য। আসলে সেকশানটা চলে জয়ন্তেরই অঙ্গুলি হেলনে।

‘এসো এসো, ‘তুমি’ বলছি কিছু মনে কর না। আজ থেকে তুমি আমার পাশে এই টেবিলে বসবে, আর এই দ্যাখো ফাইলে কী আছে। আমাদের এই আন্ডারটেকিং-এর কাজ সারা বেঙ্গলে। তুমি লাকি, কলকাতায় পোস্টিং পেয়েছ।’

দেখতে না দেখতে অসীমের ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড জয়ন্তদা। কেন সে এত অল্প বয়সে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে থেকে শুরু করে তাদের পাকিস্তান থেকে আসা, মায়ের সংসারে খাটাখাটুনি ইত্যাদি কাহিনি দুদিনেই জানানো হয়ে গেল। শুনে জয়ন্তদা একটু হেসে শুধু বলেছিল, ‘এতো আজ-কাল-পরশুর গল্প। ওটা ভুলে যাও। কাজের কথায় এসো। কলেজ জীবনে এসএফআই করতে নিশ্চয়ই। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলে। বাঃ, খুব ভালো। তাহলে তো তাহলে মানসিক ভাবে প্রস্তুত।’

কীসের জন্য প্রস্তুত জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে যায়। ক্যান্টিনে জয়ন্তদার সঙ্গে তার মতো আরও ক’জন চেলা বসে। জমিয়ে আড্ডা কাম লেকচার। না, অফিসের কথা হয় না। কথা হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, চায়নার উন্নতি নিয়ে। সে সব দেশে সাধারণ মানুষ দারিদ্র থেকে মুক্তি লাভ করেছে, তাদের

খাওয়া-পরা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব কিছুর ব্যবস্থা সরকার করে, কারণ দুটো দেশই হচ্ছে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক।

‘বুঝলে অসীম, আর মার্ক্সবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি।’

জয়ন্তদার হাত ধরে চলতে চলতে কবে কখন অজান্তেই বাঙ্গালি মার্ক্স মার্ক্সবাদে হাতে খড়ি হয়ে যায়। তার জন্যে অবশ্য তাকে মার্ক্সের লেখা বইটাই পড়তে হয়নি, জয়ন্তদাও পড়েনি। তারই মতো কয়েকটা প্যাম্পফ্লেটে চোখ বুলিয়েছে। আসল কথা পার্টির নেতাদের বক্তৃতা শোনা আর পার্টির যাবতীয় প্রোগ্রাম কার্যকর করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই মার্ক্সবাদী হওয়া যায়। বাড়িতে কাউকে অসীম বলেনি, কত নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে জয়ন্তদা অনায়াসে আলোচনা চালায়। যেমন ক্যান্টিনে টিফিন খাওয়ার সময় জয়ন্তদা সমানে বোঝান’, পাকিস্তান থেকে তারা বেশিরভাগ ভিটেমাটি হারিয়ে এদেশে এসেছিস, সেখানে প্রচুর দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে, অনেক বীভৎস কাণ্ডকারখানাও। কিন্তু কেন এ সব হয় কেউ বলে না। সব সাম্রাজ্যবাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির পরিণাম। আর এই পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি হলো ধনতন্ত্র। আরে, মুসলমানরা অত্যাচারী নয়, তারাও হিন্দুদের মতোই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার। আমরা তো শত শত বছর হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে বসবাস করে এসেছি, কখনো পার্টিশন হয়েছে, দাঙ্গা হয়েছে, রিফিউজি হয়েছে কোনো জাত?’

পাশের টেবিলে প্রতিদিনের মতো টিফিনে বাঁধাধরা ডিমের ডেভিল খেতে খেতে অ্যাকাউন্টসের হেড অর্ধেন্দুবাবু গলা বাড়িয়ে বলেন, ‘তখন দাঙ্গার দরকার হতো না। শতশত বছর তো বাইরে থেকে এসে হামলা চালিয়ে পাঠান মোগলরা রাজত্ব করেছে। মুসলমানদেরই জমানা ছিল। তুর্কি, উজবেক, আফগান যে যার প্রাণ চায় করেছে, হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গেছে, রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, গলায় গামছা দিয়ে হাজার রকমের ট্যাক্স আদায় করেছে, হিন্দুর মেয়ে কত তুলে নিয়ে গেছে সে কথা তো ছেড়েই দিলাম। বাধা দেবার বুকের পাটা ক’টা হিন্দুর ছিল। ওই তো সবেধন নীলমণি রাণা প্রতাপ আর শিবাজী। আমরা বাঙ্গালিরা তো কস্মিনকালেও ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারিনি।’

জয়ন্তদা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার মধ্যে অর্ধেন্দুবাবু খাওয়া শেষ করে দাঁড়িয়েছেন, হাত নেড়ে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে চলেন, ইংরেজ এসে আমাদের জান-মান-ধন সব বাঁচালো, আমরা বাঙ্গালিরা দুটো ইংরেজি পড়ে পেশোয়ার থেকে রেশ্মুন কাজকর্ম করে সুদিনের মুখ দেখলুম। হতচ্ছাড়া জাতের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সাহেবের পিছনে লেগে গেলুম। ইংরেজের সঙ্গে চালাকি। তারাও যাবার আগে ওই কমিউনিজমের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। স্বদেশিদের সব জেলে পুরে মার্ক্স এঙ্গেলস পড়িয়ে কমিউনিস্ট বানিয়ে ন্যাশনালিজমের দফা রফা। বিলেতে পড়তে যাওয়া ইয়ং ছেলে ছোকরাদের

কমিউনিস্ট করে দেশে ফেরাল। ব্যাস, কেবলা ফতে। দেশ স্বাধীন করবি, কর, দেখ কী ঘণ্টা পাবি। বার্ট অর্থ পলিসি, বুঝলে, যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় সব সম্পত্তি পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যাওয়া, যাতে শত্রুরা জয়লাভ করলেও ভোগ করার কিস্যু পাবে না। ব্রিটিশ রেখে গেল কমিউনিস্টদের। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সব কলকারখানা বন্ধ, স্টেটের অর্থনৈতিক ভিত্তিটা ভেঙে চুরমার। দেখ, জয়ন্ত, আর যাই কর, পার্টির হয়ে তোতা পাখির মতো বুলি কপচিও না। ‘অর্ধেন্দুদা, আপনার সঙ্গে আমি আর এক দিন বসব। এখন আমি এদের সঙ্গে কথা বলছি।’

‘সে তো বলবেই। তোমাদের শিকার ধরার খান্দাবাজি জানতে কারও আর বাকি নেই।’ রাগে গরগর করতে করতে অর্ধেন্দুবাবু চলে যান। জয়ন্তদা গলা নামিয়ে বলে, লোকটা এক নম্বরের রিঅ্যাকশানারি, প্রো-ক্যাপিটালিস্ট, খুব ডেঞ্জারাস। তোমরা এক দম ওর কথায় কান দেবে না। ধারে কাছেই ঘেঁষবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। হিন্দু মুসলমান উভয়েই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার। পূর্ববঙ্গে কী হলো, হিন্দু মুসলমান দুটো ভিন্ন শ্রেণী হয়ে গেল। হিন্দুরা মাইনরিটি, কিন্তু ধনী— জমিদারি, দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য সব হিন্দুর, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ক্লাস পুরো হিন্দু, যেমন স্কুলের টিচার হিন্দু, কলেজের প্রফেসর হিন্দু, কোর্টকাছারির উকিল হিন্দু, ডাক্তার বদ্যি সব হিন্দু। আর মুসলমান হচ্ছে গরিব অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া, গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মেজরিটি। এমন অবস্থা কতদিন চলতে পারে? যাকে দাঙ্গা বলা হয় সেটাতো আসলে শ্রেণী সংগ্রাম। আর শ্রেণী সংগ্রামের উদ্দেশ্য কী? সামগ্রিক ধনের পুনর্বন্টন, ভারসাম্য আনা। ‘বর্ধমানের সুবোধ মিন মিন করে বলে,’ কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও তো জমিদার হিন্দু ছিল আর ব্যবসাদার মাস্টার, উকিল, ডাক্তার, ফাক্তার, কেরানি, অফিসার সবাই এখানেও হিন্দু। কই, দাঙ্গা তেমন হয়নি। তাছাড়া হিন্দু গরিবও তো প্রচুর, এই তপশিলি জাতের বেশিরভাগ গরিব, নমশূদ্র, হাড়ি, বাগদি, ডোম টোমরা—।’

জয়ন্তদা বাধা দিয়ে বলেন, ‘ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা আলাদা। এখন আমরা শুধু ইস্ট বেঙ্গলের কথা আলোচনা করছি।’

অসীমের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি থেকে আসা সহকর্মীদের পালটা খুচখাচ সমালোচনায় মাথা ঘামায় না। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে আসলে শ্রেণীসংগ্রাম সে সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। বাংলাদেশ থেকে এখন আকচার মুসলমানরাও ভারতে ঢুকছে, তো কী হয়েছে। এই পার্টিশনটাইতো ইংরেজদের বজ্জাতি। আমরা তো এক দেশ, এক জাতি (যদিও পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ এত ভিন্ন)। তাছাড়া কারা আসছে দেখ, বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি কি? না, সব ওদেশের গরিবগুর্বো মানুষ, যাদের ওখানে দুবেলা

দুমুঠো খাদ্য জোটে না। সর্বহারার আবার বর্ডার কী? পেটের খান্দায় মানুষ যেখানে পারবে যাবে। পার্টি মুখে না বললেও ক্যাডার দিয়ে যারা আসছে তাদের ঢুকতে, সেটল করতে সাহায্য করছে। করাই তো উচিত। সত্যি, অসীম জয়ন্তদার সঙ্গে একেবারে এক মত। বাঁকুড়ার নিখিলের আবার সরল মন, বলে ফেলে, ‘তাছাড়া এরা সব ভোটের হয়ে আমাদের পার্টিকে ভোট দেয়, তাই না জয়ন্তদা?’

একটু যেন থতমত খেয়ে যায় জয়ন্ত। বিরক্ত মুখে বলে, ‘এখানে আবার ভোটের কথা আসে কী করে। গরিবের বেসিক প্রবলেমের কথা হচ্ছে।’ শ্রেণী সংগ্রামের প্রসঙ্গে চলে যায় জয়ন্ত। খেটে খাওয়া মানুষের শ্রেণীশত্রু সব পুঁজিপতি এবং খুব সুবিধাজনকভাবে বেশিরভাগই আবঙ্গালি। বাঙ্গালি তো এখন রাজনীতি, শোষিতের মুক্তি আন্দোলন আর সাহিত্য সংস্কৃতিতেই নিবেদিতপ্রাণ জাতি, কলকারখানা, ব্যবসাত্যাবসা করার মতো তার আর মানসিকতাই নেই। কাজেই মুখে না বললেও, শ্রমিক প্রচুর হিন্দিভাষী হলেও, স্লোগান সব হিন্দিতে হাঁকা হলেও, যেন বাঙ্গালি শ্রেণীশত্রু তেমন না থাকায় বাঙ্গালি নেতাদের ঠিক গায়ে লাগে না। কোনো না কোনো কারখানায় ধর্মঘট প্রতি দিনের ঘটনা। পুঁজিপতি মাত্রেরই কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার উন্মুক্ত আহ্বান জারি। ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালিদের গড়ে তোলা পুরনো স্বদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও বাদ যায় না।

বাড়িতে মামার খেদ, আরও একটা ইন্ডাস্ট্রি লালবাতি জ্বালল। কাস্তে হাতুড়ি মানেই সব কাটো ভাঙ্গো ভাঙ্গো, এই তাদের সিটুর ছব্বা। হাওড়া ছিল ভারতের শেফিল্ড, এখন শিল্পের মরুভূমি। ওরে, তাদের ছেলেপুলেরা খাবে কী, কোথায় কাজ করে বাঁচবে, একবার ভেবে দেখেছিস? এই পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের মানুষকে কাজ দিত, মুখের অন্ন জোগাত, অমিতাভ বচ্চন পর্যন্ত কলকাতায় চাকরি করে গেছে। আজ নিজেদের ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত এ রাজ্যে চাকরি নেই, অসহ্য। অসীমের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এখন শুধু সকালে বাজারটা রান্নাঘরে নামিয়ে রেখে স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া আর রাতে ফিরে দুটো মুখে দিয়ে শোওয়া।

বেশ কয়েক বছর সিটুর কর্মকাণ্ডে নিবেদিত একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে কাজ করার পর অবশেষে সেই পরম লগন এল, তার বহু আকাজ্কিত সম্মানলাভ। মার্ক্সবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেল। জয়ন্ত তাকে ডেকে নিয়ে বলে, ‘আজ ক্যান্টিনে নয়, চল একটু বাইরে কোথাও বসি।’

একটু হেঁটে এগিয়ে পুরনো নিউ দেশবন্ধু কেবিনে দুজনে বসে।

কী খাবে? আমি খাওয়বো আজ। ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলি? আর চা, কী বল।

মাথা হেলায় অসীম। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেলে
জয়ন্ত বলে, অসীম এই যে তুমি পার্টির মেন্সার হলে এর পুরো
অর্থটা কী, বুঝলে?

কী জয়ন্তদা?

লেফট ফ্রন্ট।

লেফট ফ্রন্ট কারা চালায়?

সিপিআইএম।

আর এই সিপিআইএম পার্টির সত্তর শতাংশ সদস্য পূর্ব
বঙ্গের, মোটে তিরিশ শতাংশ পশ্চিমের। তাহলে ব্যাপারটা কী
দাঁড়াল, আমরা বাঙালরা কার্যত পশ্চিমবঙ্গের হর্তাকর্তাবিধাতা।
এই যে সিটির সব ট্রেড ইউনিয়নগুলো, কারা লিডার? বেশির
ভাগ পূর্ববঙ্গের এবং তোমার মতো উদ্বাস্তু। হ্যাঁ, তারা তোমার
চেয়ে আগে এসেছে, তুমি ১৯৬৪তে এসেছ, গুঁরা ১৯৫০ কী
১৯৪৭-এ। বয়সে খানিকটা বড়ো। ব্যস, ওইটুকুই তফাত।
ক্যাবিনেটে কতজন মন্ত্রী ওপার থেকে আসা, জানো তো?
তাদের প্রতিপত্তি দেখছ? কেমন লাগছে শুনতে? এতকাল
উদ্বাস্তু হয়ে মামার বাড়িতে বলতে গেলে আশ্রিতের জীবন,
তোমার মায়ের সকাল থেকে সন্ধ্যা বিনামাইনের দাসীবৃত্তি।
কেন, কারণ তোমারা ছিন্নমূল, তোমাদের পায়ের তলায় মাটি
ছিল না। আজ সেই মাটি পেতে চলেছে, বুঝলে?

কৃতজ্ঞতায়, আবেগে গলা দিয়ে স্বর বেরয় না অসীমের,
মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

সেই গানটা মনে কর, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, ‘জাগো,
সর্বহারা অনশনবন্দি ক্রীতদাস—’



মনটা আজ তার শান্ত, পরিপূর্ণ। কাকে বলবে তার এই
সাফল্যের কথা। একজনই তো বুঝবে, মা। অসীম তাড়াতাড়ি
আজ বাড়ি ফেরে। মায়ের অবশ্য তখনো হেঁশেল সারা হয়নি।
ছোড়দার বিয়ের পর মায়ের খাটুনি আরও বেড়ে গেছে।
দুজনের অফিসের ভাত, এখন আবার টিফিন করে দিতে হয়,
বিকেলে জলখাবার লাগে। আগে ছোড়দা বাইরে যা হোক খেয়ে
নিত, বাড়ি ফিরে চা বিস্কুট, বড়োজোর এক বাটি মুড়ি মাখা।
বিয়ের পর রুটিন পালটে গেছে। ফিগার সচেতন রিসেপশনিস্ট
বউ বাড়ির রান্না ছাড়া কিছু মুখে দেয় না। তার নিজের তো
সংসারে হাত লাগাবার প্রশ্ন ওঠে না, সে তো ছেলের মতো
চাকুরে, ছেলেরা কী সংসারে কুটোটি নাড়ে! যাই হোক, এত
কথার কোনো প্রয়োজন হয়নি। বউমাকে মামি ‘একটু রান্নাঘরে

হাত লাগাও না’, বলতে না বলতে ‘না না থাক, ওর আপিস
আছে,’ বলে মা-ই আগ বাড়িয়ে টিফিন তৈরিতে লেগেছেন।
ক’দিন যেতে না যেতেই বউদি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে
ছোড়দাকে বেশ উঁচু গলায় বলে, ‘তোমাদের বাঙালদের মতো
হাড়কিপটে জন্মে দেখিনি। মোটা কাজের লোকও একটা রাখতে
পার না, সব ওই বয়স্ক মানুষটার ঘাড়ে। চোখের চামড়াও নেই,
ধন্য বাবা!’

দুদিনের মধ্যে রবির মা নিয়োগ, ছোড়দার উদার ভঙ্গিতে
ঘোষণা, ওর মাইনেটা আমিই দেব। মামি তো এত বছর
শুয়েবসে প্রচুর মেদ এবং বাতের ব্যথা সঞ্চয় করেছেন। ভারী
শরীরে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটু চেপে ধরে মন্তব্য করেন, ‘তবু যা
হোক পিসির জন্য দরদ দেখালি, মায়ের বেলা তো অষ্টরস্তা।’

ছোড়দা ছাড়বার পাত্র নয়, সটান জবাব দেয় ‘মাকে পিসির
মতো খাটতে দেখি, তখন দরদ দেখাব।’

বউদি চালাক মেয়ে, কথা বাড়তে দেয় না, ‘ঠিকে কাজের
লোক একটা থাকলে সংসারে সুবিধা, মা’।

তবুও অসীম চাকরিতে যোগ দেবার পর প্রথম মাসের
মাইনে থেকে মায়ের জন্য কালো ফিতে পাড় সাদা শাড়ি কিনে
নিয়ে প্রণাম করলে তিনি কেঁদে ফেলে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন,
‘এবারে আলাদা বাসা কর, আমি আর কত কাল দাসীবৃত্তি করে
যাব।’

হ্যাঁ, সে কথাও জয়ন্তদার সঙ্গে হয়েছে। ভাড়া বাড়িটাড়ি
নয়, সুবিধে মতো একটা কোনো নতুন হাউসিং-এ ফ্ল্যাট পাইয়ে
দেবেন। তার আগে হাউস লোনটোনের বন্দোবস্ত করতে হবে।
স্যাংশান হয়ে যাবে, সে আশ্বাসও পেয়ে গেছে। ওই ফ্ল্যাট হয়ে
গেলেই তোমার পায়ের তলায় মাটি একেবারে পাকা, বুঝলে
অসীম।

খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল।
মা, জানো, আজ একটা দারুণ খবর আছে।

কী দারুণ খবর রে? ভালো খবর নিশ্চয়ই। মায়ের রোগা
মুখে হাসির ছোঁয়া। আলতো করে ছেলের মাথায় পিঠে হাত
বোলান।

আমি পার্টির মেন্সার হয়ে গিয়েছি।

পার্টি! কী পার্টি রে?

মা, বেঙ্গলে তো একটাই পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি, না, যাকে
বলে ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। আমাকে তার সদস্য
করে নিয়েছে।

মায়ের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। অসীমের পিঠে রাখা
হাতটা নামিয়ে নেন। রক্তহীন সাদা মুখ।

তুই কমিউনিস্ট! কমিউনিস্ট হয়েছিস! কী বলছিস কী?

হ্যাঁ, হয়েছি। তাতে তুমি এমন করছ কেন? কী হলো?

‘ওরে’ তোর বাবা যে ওই কমিউনিস্টদের ভীষণ বিরুদ্ধে

ছিলেন, বলতেন, বিশ্বাসঘাতকের দল, আগাগোড়া
ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, ওরাই সবচেয়ে আগে
ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ সমর্থন করেছে। যে দেশভাগের ফলে
লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে কুকুর
বেড়ালের মতো খেদানো হচ্ছে, অসংখ্য ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা
ঘটছে। দেশভাগের জন্যই আজ পূর্ববঙ্গে আমাদের এই অবস্থা।
আর তুই কি না—

দেখ মা, সে অনেক কথা। তুমি হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারটা
বল তো? পার্টিশন তো পুরো ইংরেজদের বজ্জাতি ছিল, আমি
এক দিন তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব, ওটা ধর্মটর্মের ব্যাপারই নয়,
স্বেচ্ছা শ্রেণী সংগ্রাম।

শ্রেণী! কীসের শ্রেণী! ওগুলো সব পুঁথি পড়া বুলি। আমার
কী শ্রেণী? আমি তো ঢাকার ভদ্র ঘরের মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ, শুদ্ধ
বাংলা বলতে লিখতে শিখেছিলাম, তোর বাবা থাকার সময় কত
পড়তাম, শ্বশুর মশাইয়ের কেনা সব বাংলা বই, বাঁধানো পুরনো
মাসিক পত্রিকা, রোজকার খবরের কাগজ, সব পড়তাম।
সংসারের যাবতীয় কাজ, উঠোন নিকোনো থেকে রান্নাবান্না, সব
কিছু করেও। তোদের বাবা, ঠাকুরদা চাইতেন আমি পড়ি। আর
কলকাতায় এ বাড়িতে? আজ আমি কোন শ্রেণী বলতে পারিস?
শ্রেণী দিয়ে মানুষের বিচার হয়। তাছাড়া আসলে ওখানে কী
ঘটেছিল, কী ঘটে, তুই তো কিছু জানিসই না।

কী জানি না, মা? সবাই সব কিছু জানে, কত আলোচনা করি
আমরা। তোমাকে সব বোঝাবো।

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলেন, রাত
অনেক হলো, কাল আবার সকলের আপিসকাছারি আছে,
সকাল সকাল ভাত চাই। আমি শুয়ে পড়ছি।

গলার স্বরে সেই পরিচিত কাঠিন্য যা তাঁর ক্রোধের বরাবর
একমাত্র প্রকাশ, অসীমরা তিন ভাই-বোন বিলক্ষণ জানে।

আনন্দ অনেকটাই মাটি। কী করবে। জয়ন্তদার পরামর্শ
নেবে? হঠাৎ মনে হলো মায়ের সম্বন্ধে বাইরের কারোকে কিছু
বলা যায় না। ঠিক করে দিদিদের সঙ্গে কথা বলবে। বড়দি তার
ছেলে-মেয়ে নিয়ে আকণ্ঠ সংসারে ডুবে আছে। সারাক্ষণ ঘরের
চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে রাখে। সিরিয়াস
কথাবার্তার অযোগ্য। বড়ো জামাইবাবুও খালি কোনোক্রমে দু’
পয়সা রোজগারের তালে থাকেন, পুরো পাতি বুর্জোয়া। ছোড়দি
তবু একটা মিস্ক বুথে কাজ করে। একটু বাইরের জগৎ সম্পর্কে
ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া ছোটোজামাই বাবু লেফটেন্যান্ট, উনিও
সিঁটু করেন।

কাজেই পরের রোববারই সকালে ছোড়দিদের ফ্ল্যাটে
সন্দেশের বাস্ক হাতে হাজির হয়, পাঁচ বছরের ভাগ্নে রাজার
জন্য একটা ক্যাডবেরিও নিয়েছে। হাজার হলেও কুটুম বাড়ি,
লৌকিকতা করাটা দরকার। ছোড়দির বাড়িতে ঢুকে আগে তার

শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে। তাঁরা নাতির
সঙ্গে গল্প করছিলেন। মিস্তির বাস্কটা শাশুড়ির হাতে ধরিয়ে
রাজার হাতে ক্যাডবেরিটা দেয়। না না, ভদ্রতা নয়, অনেক দিন
পরে এল, তাই। মা, মামার বাড়ির সব কেমন আছে ইত্যাদি
ফালতু আদানপ্রদানের পর মাঝে মাঝে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
তারপরই জামাইবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে। তার পার্টির
মেম্বার হওয়ার সংবাদটা দেয়। ‘বাহঃ, শালাবাবু, তুমি তো একটা
কাজের মতো কাজ করে ফেলেছো। মেজকাঁকাকে বলব, খুব
খুশি হবেন। আমার আবার মেম্বারটেন্সার হওয়ার মতো অত
এম্বু নেই, সংসারে অনেক সময় দিতে হয়, তোমার দিদিও তো
বাইরে কাজ করে কিনা, ছেলের স্কুল আছে। বাবা-মা বয়স্ক
মানুষ, এটা সেটা শারীরিক সমস্যা লেগেই আছে।

ডাক্তার-ওষুধপত্র সেবাসুশ্রম্যার ব্যবস্থা করতে হয়। অনিতা,
অনিতা, শোনো তোমার ভাইটির কীর্তি। আর শালাবাবু,
একেবারে দুপুরে খেয়ে যাবে, রোববার বলে বাজার থেকে
খাসির মাংস এনেছিলাম, বেশ সেলিব্রেশন হবে।’

অতঃপর দেশের আর পাঁচটা অ-বামপন্থী রাজ্যের করুণ
দশা ও কেন্দ্র সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ
আচরণের জোর আলোচনায় দুজনে মেতে যায়।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর জামাইবাবু বিশ্রাম করতে শোয়ার
ঘরে। দিদি ভাই একান্তে বসে বৈঠকখানায়। ‘মা কেমন আছে
রে? তোর খবরে খুশি?’

‘না, একেবারেই না। তাইতো তোর কাছে এসেছি জিজ্ঞাসা
করতে, বাবা নাকি কমিউনিস্টদের খুব বিরোধী ছিল?’

বাবার নাম করতেই ছোড়দির মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

‘তোর কিছু মনে আছে পাকিস্তানের কথা?’

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ছোড়দি নীরবে মাথা নাড়ে, না।

তোর তো তখন ন’ বছর বয়স, বড়দির বারো। তোদের তো
কিছু না কিছু মনে থাকার কথা।

কতদিন আগের কথা। তারপর আমরা দেশ থেকে চলে
এসেছি। কোনো যোগাযোগও আর নেই, অত কি মনে থাকে?

আরে, সব খটনার কথা বলছি না। মোটামুটি অন্তত একটা
আভাস তো দিতে পারিস বাবা পার্টিশান সম্পর্কে,
কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কী বলত। তাছাড়া হিন্দুদের তো
ওখানে সব ভালো অবস্থা ছিল, আমরা বাড়িঘর জমিজায়গা,
এত সম্পত্তি সব ছেড়ে হঠাৎ এরকমভাবে বলতে গেলে এক
বস্ত্রে একদিন চলে এলাম কেন?

কোথায় সব হিন্দুদের ভালো অবস্থা। কত গরিব হিন্দু ছিল।
ওসব জমিজায়গা সম্পত্তি ফস্পত্তির কথা রাখ। ভারি তো
সম্পত্তি। জমির কী হ্যাপা, তার ওপর ফসলের গতি কী হতো
তোর কি ধারণা আছে? আরে বসত বাড়িতেই তো আগুন
ধরিয়ে দিয়েছিল, বলেই ছোড়দি ডান হাত দিয়ে নিজের মুখ



চেপে ধরে।

কারা কারা আগুন দিল? আমরা কী করলাম, বাবা তখন কোথায়—

চুপ চুপ। আর কথা নয়।

ছোড়দি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অসীম একা বসে থাকে। স্তম্ভিত। বেশ খানিকক্ষণ। বেলা পড়ে আসে। জামাইবাবু রবিবারের নিটোল দিবানিদ্ৰা সেরে বসার ঘরে এসে অসীমকে বসে থাকতে দেখে বলেন, ‘শালাবাবু, তুমি কি ঠায় বসে আছো নাকি? তোমার দিদি ওইয়ে তক্তাপোশটাকে ডিভান বানিয়েছে। ওখানে একটু গড়িয়ে নিলে পারতে।’

না, না, আমার তো দুপুরে শোয়া অভ্যাস নেই। ছোড়দির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

বেশ বেশ। অনিতা, একটু চা-টা দাও ছোটো ভাইটাকে। তার আনা সন্দেশের সদ্যবহার করা যাক। দুপুরে তো বাস্কাটা খোলাই হলো না। কী বললে, বাবা মা খেয়েছেন? ও হ্যাঁ, গুঁরা তো আবার খাসির মাংস খান না।

জল বসিয়েছি। এখুনি হয়ে যাবে।

অতঃপর সন্দেশ, চানাচুর আর চা খেয়ে অসীম উঠে পড়ে। ছোটো জামাইবাবু তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে পিঠে হাত রেখে বলেন, ‘তুমি এলে, দিনটা চমৎকার কাটল।’

এরকম ছুটিছাটায় এসে যাবে। বুঝলে?’

ছোড়দির কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খায়। পাকিস্তানে অনেক গরিব হিন্দু ছিল, তাদের নিজেদেরও এমন কিছু সম্পত্তি বা জমিজায়গা ছিল না। চাষবাস ফসলের কী গতি হচ্ছিল, সেটা না হয় তার তিন বছর বয়সে জানাবোঝার কথা নয়। কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগাটা তো বোঝার কথা। আচ্ছা, কী রকম বাড়ি ছিল তাদের? নিশ্চয় গরিবগুর্বোর মতো খড়ের চাল নয় যে একটা কিছু জ্বেলে ছুড়ে দিলেই আগুন ধরে যাবে, যেমন সিনেমায় দেখায় গরিব চাষিরা খাজনা না দিতে পারলে বা মহাজনের ধার না শুষতে পারলে, কী কোনো রকম বেগড়বাই করলে তাদের ঘরবাড়ি জমিদার জোতদার মহাজন আগুন ধরিয়ে অসহায় খেটে খাওয়া লোকগুলোকে পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অসীম হাঁটে। সমানে হাঁটে। মনটা আরও অস্থির হয়ে গেছে। এতদিন সমানে মস্ত্র জপের মতো শোনা পূর্ববঙ্গে ধনী হিন্দু আর গরিব মুসলমানের সরল হিসেবটায় এখন গরমিল কেন?

শেষে যখন বাড়ি পৌঁছায় তখন রাত দশটা প্রায় বাজে। ছোড়দারা শ্বশুরবাড়িতে উইকএন্ড সেরে একদম সোমবার অফিস করে ফেরে। মামি নিজেদের শোয়ার ঘরে টিভির বাংলা সিরিয়েলে মগ্ন। মামা একফালি বৈঠকখানায় সেকলে লম্বা পা মেলা চেয়ারে আধশোয়া। এক পাশে রোববারের সাময়িকীটা খোলা পড়ে আছে।

কীরে, এতক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়ল, সেই কখন বেরিয়েছিস? তা, অনিতারা সব ভালো আছে? বেশ বেশ। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। যা ভেতরে যা, তোর মা তোর জন্য বসে আছে নিশ্চয়। যাই, আমিও একটু টিভি দেখেটেকে শুয়ে পড়ি। মামা উঠে পড়েন।

কেন যে মা এটা করে। কতবার বলেছি, খেয়ে শুয়ে পড়বে। আমি ঠিক বেড়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে থালাবাটি কলতলায় রেখে দেব।

বলতে বলতে অসীম হাত মুখ ধুতে যায়।

মা, তুমি আবার আমার খাওয়ার জন্য বসে আছো।

অনুযোগের স্বর অসীমের। ঘরের ভেতর থেকে জবাব আসে, না, ঠিক তোমার খাওয়ার জন্য নয়। তোমাকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল, দিনের বেলা তো সময় হয় না।

একটু থমকে যায় অসীম, মা তখনই ‘তুই’ থেকে ‘তুমি’তে চলে যান তার মানে পরিস্থিতি সঙ্গিন। ঘরে ঢুকে দেখে তক্তপোশের তলা থেকে মায়ের সেই আদিকালের ছোটো টিনের ফুলকাটা সূটকেসটা বেরিয়েছে, একমাত্র যেটা নিয়েই তারা দেশ ছেড়েছিল। সকলের দু’চারটে মামুলি জামাকাপড় নাকি ছিল। পরে মা তার পোশাকি শাড়ি-ব্লাউজের সেট আর শীতে গায়ে দেওয়ার চাদরখানা রাখেন। এখন সেটা থেকে মা

কী বের করছেন? একটা মলাট দেওয়া খাতা।

তোমাদের বাবা শেষের দিকে মাঝে মাঝে লিখতেন। কী লিখছে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, “যা লিখছি সবই তোমার জানা। যারা কোনোদিন হয়তো জানতে পারবে না তাদের জন্য লিখে যাচ্ছি। যত্ন করে রেখো। কিছুতেই হাতছাড়া করো না। আমাদের জন্য পূর্বপুরুষ, জমিজায়গা, পড়াশোনার ঐতিহ্য, সনাতন মূল্যবোধ, সব রেখে গিয়েছিলেন। আমি হয়তো ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারবো না। তাই লিখছি।” আর আমি, অন্যেরা গয়নাগাটি, দলিলটলিল যেমন ভাবে লুকোত, তেমনই ভাবে খাতাটাকে বিস্কুটের টিনে পুরে এঁটে বন্ধ করে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। বহু কষ্টে নিয়ে এসেছি। তুমি বাবার উত্তরাধিকারী। এখন সাবালক, স্বাবলম্বী। বাবার কথাগুলো তোমার জানা দরকার। এই নাও।

খবরের কাগজের মলাট দেওয়া একটা চটি এক্সারসাইজ বুক। পুরনো অতি মলিন জীর্ণ চেহারা, কালের অমোঘ ছাপ। বাবা আমার জন্য কী লিখে রেখে গেছে। অসীমের মনে প্রবল কৌতূহল, আবার কেমন যেন একটা প্রচণ্ড ভয়ভয় বোধ।

আমি তো অনেক দিনই সাবালক। তুমি তো আগেই আমাকে খাতাটা দিতে পারতে। আর দিদিরা—

যত্ন করে তুলে রাখো— তাকে বাধা দিয়ে মা বলেন, পুরনো বাতিল খাতা ভেবে রবির মা আবার যেন ফেলে না দেয়। রান্না ঘরের দিকে চলে যান।

সত্যি, কোথায় রাখবে খাতাটা। ঘরে যে ছোটো আলমারিতে তাদের দুজনের যাবতীয় জিনিসপত্র থাকে, সেখানেই তার পরীক্ষার সার্টিফিকেট, চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইত্যাদি দরকারি দলিলের বড়ো খামটায় ঢুকিয়ে রাখে। খাওয়াদাওয়া সেরে মা ও ছেলে শুয়ে পড়ে। ঘুম নেই অসীমের চোখে। মনে উদগ্র কৌতূহল, কী আছে খাতাটায়, কখন কীভাবে পড়ে জানবে। আলো জ্বাললে মায়ের পাতলা ঘুম ভেঙে যাবে। কোথায় পড়বে? হ্যাঁ, বৈঠকখানায়, সেখানে মামার লম্বা আরামকেদারা ছাড়া গোটা চারেক কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিলও আছে। আসলে এটা একদা তাদের পড়ার ঘরও ছিল। অসীম পা টিপে টিপে উঠে আস্তে করে আলমারি খুলে সেখান থেকে খাতাটা বের করে নিয়ে ঘর থেকে বেরয়। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় যায়। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে। খাতাটা টেবিলে রেখে খোলে। ছাত্রাবস্থায় যেমন করত। আজও কি কোনো পরীক্ষার জন্য অসীম তৈরি হচ্ছে?

“৭ই আগস্ট ১৯৬১। আমি অমূল্য কুমার দত্ত, পিতা অতুল্য কুমার দত্ত, মাতা সুকুমারী দেবী। আমার স্ত্রী রমা, দুই কন্যা, অমিতা, অনিতা ও শিশুপুত্র অসীম। নিবাস পিতৃপুরুষের ভিটায়, গ্রাম কুলদলি, জেলা খুলনা, অধুনা পূর্ব পাকিস্তান।

কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে চারিদিকে যা যা ঘটছে সেগুলি নথিভুক্তকরণ প্রয়োজন। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে যে ভারতীয় সভ্যতার অংশ তার প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বমানের সাহিত্য ছিল, দর্শন ছিল, ছিল গণিত জ্যোতির্বিদ্যা আরও কত কী। ছিল না ইতিহাস। এই দেশের মাটিতে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, বার বার বর্বর বিদেশিরা আক্রমণ করেছে, শেষে স্বাধীনতা হারিয়েছি। সে সব বৃত্তান্ত কেউ লিখে রাখেনি। সব কালের করাল গ্রাসে বিলুপ্ত।

এমনকি আমরা কেউ নিপীড়নের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করে রাখিনি, রাখি না। ইহুদিরা যেটা করে। আমার ক্ষমতা অতি সীমিত, উদ্দেশ্য অতি সীমিত। একটি বিশেষ সময়ে একটি স্থানের ঘটনাবলী। যাতে স্মৃতি অন্তত যেন থাকে, সময়ের সঙ্গে বাস্তবের সব কিছু নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর শিকড় ছিঁড়ে পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস হলো পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস। সদস্যরা দেশ ভাগের বিরোধী হলেও পাকিস্তান হবার পর মেনে নিয়ে রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শ সেই গান্ধীবাদ, সেকুলারিজম আর সমাজতন্ত্র। তাঁরাই স্বাধীনতার পর পর ধীরেন দত্তের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কঙ্গটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লিগের সদস্যরা বিরোধিতা করে শুধু উর্দু আর ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব পাশ করলো। বাবা ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য। যদিও পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কিরণ শঙ্কর রায় নিজেই পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, তবু অনেক কংগ্রেসির মতো বাবাও দেশের মাটিতে থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুর সসন্মান অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। কার্যত ৪০-এর দশকের শুরু থেকে, বিশেষ করে '৪৬-এর নোয়াখালি হিন্দু উৎসাদনের পর থেকে পূর্ববঙ্গের এখানে-ওখানে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছিল। পূর্ণ শান্তি কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫০ সালে জেহাদি মুসলমানদের আক্রমণ এত ভয়ঙ্কর হলো যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত এবং সাড়ে চার মিলিয়ন হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম লিগের হিন্দু সদস্য বিশ্বাসঘাতক যোগেন মণ্ডল পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক থেকে ইস্তফা দিয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে ভারতে পালিয়েছিল। কিন্তু বাবা দেশ ছাড়েননি। পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগের প্রশ্নই মনে আসেনি। আর একটি কারণ, খুলনা হিন্দুপ্রধান জেলা, তাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ ছিল। পাকিস্তানে তো এ জেলার আসারই কথা নয়। নেহাত মুসলমানপ্রধান মালদা ও মুর্শিদাবাদকে ভারতে রাখতে খুলনা আর চট্টগ্রাম পাকিস্তানে এসেছে। তবে কতদিন এই নিরাপত্তা? জীবনের শেষের দিকে বাবা নিজেই আমার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। মরার আগে

বললেন, 'অমূল্য, কথা দে, বাপঠাকুরদার মাটির জন্য লড়াই করবি, প্রাণ থাকতে দেশ ছাড়বি না।'

'না ছাড়ব না, কথা দিলাম।' উত্তর দিয়েছি। তারপর এক দশক কেটে গেছে।

অধীর হয়ে অসীম চোখ বোলায়, সব ধরাবাঁধা সেন্টিমেন্ট, যেন সিনেমার পরিচিত ডায়লগ, সব জানা কথা, কয়েকটা তারিখ, কয়েকটা জায়গার নাম, কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা, সব হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার, তাদের ব্যবসাবাণিজ্যে হামলা, তাদের জমির ফসল কী গাছের ফল কেটে নেওয়া, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, জোর করে মুসলমান বানিয়ে নিকে করা, অতঃপর পরিবারের বাকিদের অবধারিত দেশত্যাগের বৃত্তান্ত। টিপিক্যাল কংগ্রেস মার্কা লেখা। খবরের কাগজের নিউজের মতো সংক্ষিপ্ত। এ সব সম্পর্কে তো অসীমের মোটামুটি ধারণা আছে। জয়ন্তদার কাছ থেকে কত শুনেছে। জমিদার, বানিয়া আর বুর্জোয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে সর্বহারা খেটেখাওয়া মুসলমানদের আক্কেশের প্রকাশ। কিন্তু তাদের পরিবারের সঙ্গে কী ঘটল, বা আদৌ কিছু ঘটেছিল কি?



হ্যাঁ, এই বার লাগাতার ক'টা বড়ো এন্ট্রি।

“১২/৭/৬৩ আমার স্কুলে বেশ কয়েকটা গ্রাম থেকে ছেলেরা পড়তে আসে, হাই স্কুল, তার ওপর সুনাম আছে। ছাত্র ও ছাত্রদের অভিভাবকরা আমাকে সম্মান করে। আমি আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার, আগের হেড রিটারার করলে আমি অ্যাক্টিং হেড হই এবং সেই অবস্থাই বছরের পর বছর চলে আসছে। লোকের কাছে আমিই হেড মাস্টার হয়ে গিয়েছি। মনে প্রাণে আমি একজন শিক্ষক, পরের প্রজন্মকে এই সমস্যা কণ্টকিত দেশের বাস্তবে টিকে থাকতে একমাত্র মেধাই সম্বল, এটা বোঝানো আমার ব্রত। বাবার রাজনীতির পথ আমার নয়। পেশা আর পরিবার। ব্যস, এই নিয়েই থাকি। একদিন স্কুলের অফিসে কাজ করছি। একজন অভিভাবক, বলাই চাঁদ বিশ্বাস হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, “মাস্টার মশাই আপনার কি একটু সময় হইব, ইস্কুলের পর কথা কইতে চাই।”

ভাবলাম তাঁর ছেলেরা কেউ বোধ হয় কোনো কুকীতি করে ফেলেছে, সেটা ধামা চাপা দেবার অনুরোধ করবেন। এরকম ক্ষেত্রে আমি একেবারে ব্যক্তিগত ধরাধরি প্রশ্রয় দিই না।

“কেন, ছেলেদের কারও সমস্যা—”

“না না। অদের কিসু ব্যাপার নাই। অ্যাকটু পার্সোনাল ম্যাটার, তাই আপনার বাড়ি গিয়া কইতে চাই।”

অবাক হই। একটু বিরক্তও লাগে। বিশ্বাস মশাইদের অবস্থা ভালো, জমিজমা আছে, চাষবাস প্রচুর, পাটের না কীসের ব্যবসাদারবাসও করেন। এমন পাটোয়ারি লোকের আমার মতো বইখাতা নিয়ে থাকা মানুষ গড়ার কারিগরের সঙ্গে কীবা কথা থাকতে পারে।

কেন, এখানেই বলুন না?

বিশ্বাস মশাই সন্তর্পণে চারিদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন। প্রায় ফিসফিস করে বলেন, না না হেইডা আপনার আমার কারও লগেই বালো হইব না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর আগমন। বাবার সময় থেকেই একটা বাইরের ঘরের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে দুটি বইয়ের আলমারি, একটি কাগজপত্র ফাইলের তাক, একটা টেবিল, কটা চেয়ার রাখা। তাঁর দলীয় কাজের জায়গা, জমিবাড়ির কাগজপত্র, বই সব থাকত। আমারও থাকে। তাঁকে নিয়ে বসাই।

বলুন কী ব্যাপার?

পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ৫০ বিঘা জমি বরাবর প্রয়োজনমত বিশ্বাস মশাই চাষ আবাদ করে আসছিলেন, যেমন তাঁর বাপ ঠাকুরদা করতেন। আমি কি জানি মন্ত্রী এম এল এ, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মেম্বার প্রত্যেকে কিছু না কিছু ছুতোনাতায় কীভাবে হিন্দুদের জমি দখল করে চলেছে? ওই যে রহিম, মইনুদ্দিন, দিব্যি রসেবসে থাকে, তার ছেলে জিয়াউল হাসান, যে ক’বছর আগেও ছিল পুরো এলাকার হেড মস্তান, সে তাঁর জমির উত্তর সীমানার মধ্যে ঢুকে বিঘা বিশেক জমি দখল করে তাতে চাষবাস থেকে শুরু করে একেবারে তিনতলা বাড়ি পর্যন্ত বানিয়ে বসেছে। শ্রেফ গায়ের জোরে। তিনি আপত্তি করলে, জিয়াউল বলে কী, ‘এত জমি লইয়া কী করবেন? বাপে তো মেলা রাইখ্যা গেছে। আমি আর কয় বিঘা লইসি। আপনাই কন মাস্টার মশাই, হেইডা ক্যামুন কথা?’

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, “এ তো দিনে দুপুরে ডাকাতি! আপনি কোর্ট কাছারি করলেন না কেন?”

আরে হেই কথাই তো কইতে আইসি। কেস করসিলাম, কেসে আমার ফেভারে ডিক্রি হইসে।

বাঃ, এতো খুব ভালো কথা। দেশে এখনো আইন আদালত কাজ করে। তাহলে আর চিন্তা কী?

আরে হেডমাস্টার হইয়া আপনে দেহি পোলাপানের লাখান কথা কয়েন। হেই মামলা মোকদ্দমা শ্যাম হইয়া রায় বাইর হইতে হইতে কত বৎসর লাইগ্যা গেল, জানেন? হেই দিকে জিয়াউল তো মস্তান থিক্কা মন্ত্রী হইয়া মাথায় চইড়া বইসে। সে তো আমাগো অঞ্চলের এম এল এ। কোর্ট বলসে, এই কয় বৎসর যে জিয়াউল আমার জমি জবর দখল কইরা রাখসে,

কোটা তুইল্যা ভোগ করসে সেই বাবদ এক লক্ষ হাইট হাজার পাঁচশত ট্যাহা তেনার আমারে দিতে হইব। হেইডা লইয়া জিয়াউল এহন আমারে উপর চাইপ ফ্যালতাসে। হরবখত শাসানি চলতাসে। টাহাটা ছাইড়া দিয়া লিখ্যা দিতে হইব, ট্যাহা পাইলাম। হক্কে আমারে বলতাসে জলে বাস কইরা কুমিরের সাথে বিবাদ কর না, ট্যাহাটা ছাইড়া দে। আপনে বলেন, এইডা আমার হকের ট্যাহা, নয়? আমি তো বেশি কিসুই চাই নাই, শুধু ন্যাইয়া বিচার চাই। কোর্ট দিসে, আমি কী করম। আপনে জ্ঞানী, ল্যাহাপড়া জানা মানুষ, আপনার উপর পাঁচ জনের ভরসা। আপনে বলেন আমার কী করা উচিত।

জনাব জিয়াউল হাসান সাহেবের মাস্তানির বহু কীর্তির কথাই কানে এসেছে। তার বাপের জমিজিরেত ছাড়াও পাটের ব্যবসা আছে। সম্ভবত সেখানেই বিশ্বাস মশাইয়ের সঙ্গে রেবারেঘির উৎস। জিয়াউলের কাজকারবারে মন ছিল না। কিন্তু পরিবারের স্বার্থে দিব্যি নজর। খাটাখাটনি করে ব্যবসা বাড়ানোর চেয়ে বিশ্বাসের জমি জবরদখল সহজ। গণতন্ত্রের এই এক দুর্বল দিক, খারাপ লোকের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। ভোটদাতা আমজনতার শিক্ষাদীক্ষা নেই, বিচার বিবেচনা নেই। বিশ্বাস মশাইকে বলি, “আপনি নিজের অধিকার ছাড়বেন না। কোর্ট আপনার পক্ষে, সেটাইতো আপনার মন্ত জোর। অটল থাকুন। আর ব্যাপারটা পাঁচ জনকে বলুন, যেন সবাই জানতে পারে কী চলছে। যাকে বলে সামাজিক চাপ তৈরি করা। জিয়াউলের মস্তিষ্ক তো তার বাপের সম্পত্তি নয়, তাকে তো আবার ভোটো দাঁড়াতে হবে।”

২৭/৭/৬৩ আমার লড়াইয়ের পরামর্শের ফল হলো আশপাশের পাঁচ গ্রামে বিশ্বাসমশাই এবং মন্ত্রী জিয়াউলের দ্বৈরথের কাহিনি মুখে মুখে রটনা হয়ে গেল। এবং ঘরের মধ্যে নয়, প্রকাশ্যে মাঠে ঘাটে সদরে কাছারিতে চায়ের দোকানে। সাধারণত আমি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র ও পড়াশোনার বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করি না। সামাজিক পারিবারিক ঘনিষ্ঠতাও প্রশ্রয় দিই না। একটু দূরত্ব রেখে চলি। শিক্ষকরা বেশিরভাগ হিন্দু হলেও মুসলমান দুজন আছে, এক বয়স্ক মৌলবি সাহেবও আছেন। সকলেই জানে আমার পরিবার পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের ঘরের লোক। তাদের এখন কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, আমি নিজে কোনো রাজনীতি করি না, তবু কংগ্রেসি বাপের পরিচয়টা তো আছে। বিশ্বাসমশাই যতই গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে থাকুন না কেন আমিই যে তাঁর পরামর্শদাতা এমন একটা গুজব দেখতে দেখতে পাঁচটা গ্রামে রটে গেল। স্কুলের ছুটির পর শিক্ষকরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে বেরয়। সার সার সাইকেল রাখা। যে যার সাইকেলের তালা খুলে রওনা দেয়। আমিও সঙ্গে আছি। একদিন বাংলার প্রতাপ গুহ তালা খুলতে খুলতে মৃদু

স্বরে বলে, “আপনি বিশ্বাসকে ভালোই পরামর্শটা দিয়েছেন।
আমাদের একটা স্ট্যান্ড নেওয়া দরকার। নইলে দেশটা
একেবারে মগের মুলুক হয়ে যাচ্ছে।”

“মন্ত্রী হয়ে যেন নবাব বাদশা বনে গেছে,” অঙ্কের বয়স্ক
বারীনবাবুর সাইকেল ম্যানেজ করতে একটু সময় লাগে, তিনি
দাঁড়িয়ে পড়ে যোগ দেন, সব জমির মালিক এনারা আর আমরা

যারা চোদ্দ পুরুষ এ মাটিতে জন্মেছি, বসবাস করেছি, আমরা
সব যেন এদের প্রজা। বিজ্ঞানের সত্যেন সেন চটপট সাইকেলে
উঠে প্যাডেল করতে করতে মত দিয়ে যায়, “হিন্দু ঐক্য খুব
দরকার, সবাই যেন বিশ্বাসের পাশে থাকি।”

৫/০৮/৬৩ ফল হলো এই, মন্ত্রীমশাই টাকাফাকা কিছু তো
দিলেনই না, উপরন্তু বিশ্বাসের মজুত করা ধানের মরাইয়ে



সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

একদিন রাতে আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল। সদরে তাদের পারিবারিক মুদিখানার দোকানে এক রাতে কে বা কারা ভাঙচুর চালিয়ে কত মাল সরিয়ে ফেলল, বাকি ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে রেখে গেল। পুলিশ কোনো ঘটনারই কোনো কিনারা করা দূরস্থান, কাউকে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারল না। কাজের মধ্যে পাঁচটা গ্রামে হিন্দুরা বেশিরভাগ ভয়ে কাঁটা। তাদের মনোভাব ফিসফাসে প্রকাশ, কী দরকার ঝামেলায়। খানিকটা জমি বই তো নয়, বিশ্বাস ছেড়ে দিলেই তো পারে। তার তো ভগবানের কৃপায় অভাব নেই। সকলে তো অমূল্য দত্তর মতো হেভি ওয়েট নয়, বাপ কংগ্রেস করা লোক, এখনো এক ডাকে সবাই চেনে। তাছাড়া নিজে মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার বলে কথা। দাস, দেবনাথ, প্রামাণিক, সরকারদের মতো সাধারণ হিন্দুদের কে বাঁচাবে। তাদের ওপরই তো চোটটা পড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

১০/০৮/৬৩ সদরে ছুটির দিনে গিয়েছিলাম বাড়ির কিছু দরকারি কেনাকাটা করতে। মুখচেনা যার সঙ্গেই দেখা তারই মুখে বিশ্বাস বনাম মন্ত্রীর ডুয়েলের আলোচনা, আমার নেপথ্য ভূমিকার প্রশংসা এবং নাটকের পরবর্তী দৃশ্যের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষার আভাস। যেন নাটক চলছে। অস্বস্তি লাগে। কাজ সেরে চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেতে বসি। হঠাৎ উদয় হলো এ তল্লাটের উঠতি মস্তান, জিয়াউলের কী রকম যেন চাচার ছেলে বদরুদ্দিন উমর। মুসলমানদের এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, পরিবারের পদবির কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আমি অমূল্য দত্ত, আমার জ্যাঠাতো খুড়তুতো সব দাদা ভাইয়ের পদবি দত্ত হতে বাধ্য। এদের তেমন কোনো প্রথা বোধ হয় নেই। “এই যে মাস্টার মশাই, চা খাইতাসেন?” আমার চিন্তায় বাধা পড়ে, “বাজারহাট করল্যান বুজি? বালো বালো।”

সামনের বেঞ্চিটায় গ্যাট হয়ে বসে। অস্বস্তি বোধ করি। মস্তানরা আমার কাছে অন্য গ্রহের জীব। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, এভাবে গায়ে পড়া কেন।

“শোনে, আপনার লগে দুইটা কথা আসে। আপনে জ্ঞানী গুণী লোক, কইলকাতা থিক্যা এম এ পাশ কইরা আইসেন। আমাগো গৌরব। আপনে পোলাপানদের পড়াইবেন, শিখাইবেন, পাশ করাইবেন। তারা উন্নতি করব, কামকাজ পাইব। খুব বালো কথা। করেন, নিজের কাম করেন। হঠাৎ ন্যাটা হইতে চাইলেন ক্যান? বাপ কংগ্রেস করত তাই? আপনে কি ইলেকশানে খাড়া হইবেন নাকি? কী, মতলবটা কী?”

“দেখুন নেতা হবার কোনো প্রশ্নই নেই। আমি শিক্ষক, ছাত্রদের নিয়েই থাকি। মতলব কিছুই নেই। আপনারা ভুল বুঝছেন।”

“তাইলে ভাইজানের কোঠা আর জমিটা বাবদ বিশ্বাসেরে ট্যাহা আদায়ের কুপারামর্শ ক্যান দ্যান?”

“কী আশ্চর্য, কোটে আপনার ভাইজানের বিরুদ্ধে কেস করে বিশ্বাস জিতেছে, কোটই টাকাপয়সার কথা ঠিক করেছে, আদায়ের হুকুম দিয়েছে। আমি এর মধ্যে কোথায়? আমি বিশ্বাসের উকিল নই, তার পক্ষে সাক্ষীও হইনি। আমি তো শুধু কোর্টেরই কথা বিশ্বাসকে মানতে বলেছি। দেখুন, আমি তো একজন শিক্ষক, মাস্টার। মাস্টার হয়ে আমি কি লোকজনদের আইন না মানার শিক্ষা দিতে পারি? আমার কর্তব্য মানুষকে সুনাগরিক করে তোলা, আইন মানতে শেখানো। আমার কাজ আমি করেছি মাত্র। এতে নেতাগিরির কী হলো।”

“শোনে হেইডা হইল মুসলমানগো দ্যাশ, হেইখানে সব জমিজায়গা খালবিল পুষ্করিণীতে আমাগো হক। বোজল্যান?”

“এ তো অদ্ভুত কথা। মুসলমান মেজরিটি দেশ বলে আমাদের হিন্দুদের কোনো হক নেই, এমন কথা কি দেশের আইনে বলে? কোটে তো মুসলমানই জজ, সরকারি উকিলও তো মুসলমান। তারাই তো ফয়সালা করেছে—”

“আরে রাখেন আপনার কোর্ট আর উকিল। ইংরেজের করা আইন আর ইংরাজি পড়া সব উকিল। আমরা হেই আইন মানি না, এই রায় মানি না। আপনারে সাবধান কইরা দিতাসি। নিজের কাম করেন। বিশ্বাসেরে আমাগো হাতে ছাইড়া দ্যান।”

চায়ের দোকানের মালিক আর চা খেতে আসা পাঁচজন দেখল, শুনল।

২০/০৮/৬৩ বদরুদ্দিনের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি চারিদিকের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। আমারও জেদ চেপে গেল। বিশ্বাস আর তার উকিল গঙ্গাপ্রসাদ বোসের সঙ্গে আলোচনায় বসি। জিয়াউল রায় হাতে পেয়েও এত মাস ধরে এক পয়সাও না দেওয়ায় তার নামে আবার নালিশ কীভাবে করা যায়। ক’দিন বাদে বাড়ি ফিরতেই রমা উদ্বিগ্ন মুখে এসে বলে, “জানো, বসাক মাসিমা এসেছিলেন, বললেন বিশ্বাস বাড়ির মেয়েরা ইস্কুল থেকে ফিরছিল, এক দল মুসলমান ছেলে নাকি রাস্তা আটকে যা তা অসভ্য কথা বলেছে, আবার ভয় দেখিয়েছে, তুলে নিয়ে যাবে। তারা তো কাঁদতে কাঁদতে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরেছে। বসাক মাসিমা তার নাতনিদের ইস্কুলে যাওয়া কিছুদিন বন্ধ করে দেবেন, ঠিক করেছেন। আমি ভাবছি অনি অমিকে কাল থেকে ক’দিন ইস্কুলে পাঠাবো না। দেখ, সাবধানের মার নেই। বলা তো যায় না—”

আমি বাধা দিয়ে বলি, “দ্যাখো ভয়ের কোনো শেষ নেই। স্কুলে যেতে ভয়, বাড়ির বাইরে যেতে ভয়, এভাবে তো বাস করা যায় না। ভয়কে জয় করতেই হবে। সব সময় রবি ঠাকুরের সেই গানটা মনে রাখ, ‘আমি ভয় করব না ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না—’ এবার রমা আমাকে থামিয়ে দেয়, “দেখ রবিঠাকুর পাকিস্তানে মুসলমান ঘিরে রাখা এক হিন্দু ছিলেন না। তাঁর ১০/১২ বছরের মেয়ে ছিল না। তাঁর সময়

অন্য, দেশ অন্য, সেটা ব্রিটিশ ভারত। এটা ভারতই নয়, অন্য দেশ, সেটা ভুলে যাও কী করে। আমি ওদের ইস্কুলে পাঠাবো না। তুমিই না হয় পড়াবে।”

“দ্যাখো, সেটা খুব খারাপ দেখাবে। যে সব মেয়েদের বাবারা শিক্ষক নয়, তারা ইস্কুলে না গেলে পড়াশোনা শিখবে কী করে?”

“আর আমাদের মেয়েদের মুসলমানেরা তুলে নিয়ে গেলে? এরকম তো আকছার হচ্ছে। তখন কী করব, তোমার রবি ঠাকুর কিছু বলেছেন? নাকি সে বিষয়ে কোনো গান লিখে গেছেন?”

১/৯/৬৩ প্রতিবেশী পাঁচ জনের সঙ্গে কথা বলি। কোন মুসলমান ছেলেরা বদমায়েশি করছে তাদের নামধাম, পিতৃপরিচয় জোগাড় হয়, সবাই তো চেনাজানার চৌহদ্দির মধ্যে, কেউ করাচি বা লাহোর থেকে উড়ে আসেনি। তাদের বাপচাচাদের ধরা হলো। বেশিরভাগই গায়েগতরে এখানে সেখানে টুকটাক কাজ করা, বড়জোর সদরে ঘরামির মুনিষ অথবা আমাদেরই জমিতে খেত মজুর বা ভাগচাষি। সকলের এক উত্তর, “কর্তা কী কমু, আমাগো কথা হেই সব ছ্যামড়ারা শোনে কই? দল অ্যাকাটা করসে, কামকাজে মন নাই, খালি বজ্জাতি কইরা বেড়ায়। মাইরা মাইরা পিঠের ছাল তুইল্যা দিতাসি, তাতেও হুঁশ নাই। আপনেরা যা মর্জি করেন, য্যামুন ইসসা শাসন করেন। আমাগো কিস্যু আপত্তি নাই। অদের পালের গোদা হইতাসে ওই মিনিস্টার জিয়াউলের চাচার পোলা বদরুদ্দিনের চালা রহিম।”

১৫/৯/৬৩ ছেলেছোকরাদের বজ্জাতির সঙ্গেও রাজনীতি জড়িয়ে গেছে। কী শাস্তি দেওয়া যায় সেই নিয়ে তর্কাতর্কি আলোচনাই সার। কারণ সবাই জানি মুখে এদের বাপচাচারা আমাদের কর্তা হুজুর করলেও আসলে দিব্যি সেয়ানা। জমি চাষ করে যেন আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে এমন ভাবভঙ্গি, ফসলের এখন যা ইচ্ছে ভাগ নেয়, তেভাগা বলে ওদিক থাক। কোনোক্রমে আমরা মালিকরা বছরের খোরাকটা পাই, জমি থেকে কোনো আয় নেই। মাঝখান থেকে কতদিন মেয়েগুলোর স্কুলে কামাই। তারপর আবার যেইকে সেই।

৩০/১০/৬৩ নমোনমো করে নিয়ম রক্ষার দুর্গাপূজা। পূজার আচার অনুষ্ঠানই সার। তেমনই কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। প্রত্যেকটি পূজা যেন এখন দায় হয়ে উঠেছে। আমরা হিন্দু তাই ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা। আর আনন্দ নেই, উৎসবের সমারোহ নেই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরাগের ঘন কালো ছায়া সংখ্যালঘুর জীবনচর্যার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অথচ এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শাসনকেই তো আমরা গণতন্ত্র বলি, আদর্শ মনে করি।

১০/১২/৬৩ গণতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে এসে গেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশন। জিয়াউলের চাচাতো

ভাই সেই বদরুদ্দিন ইলেকশানে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের সব পরিবার কেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে অবস্থা ভালো এমন কেউ নেতা হয়। অমনি তার গরিব আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব যে যেখানে আছে সব তার চেলা হয়ে যায়। যেমন, বদরুদ্দিন। জিয়াউলের নিজের নয়, দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই, না পড়াশোনা করছে না কোনো কাজের কাজ। এখন ভাইজান হচ্ছে ভরসা। প্রচার করা হয়েছে মন্ত্রী জনাব জিয়াউলের নামে, তারই তো ক্যান্ডিডেট বদরুদ্দিন। মনে মনে আশা করেছিলাম হিন্দুরা অন্তত এক জোট হয়ে এবার ভোট দিয়ে অসন্তোষটা প্রকাশ করুক। করবে কী? সন্দেহ, আমরা তো মূলত ভীরুর জাত। কী আশ্চর্য, ইলেকশনে বদরুদ্দিন হেরে গেল। সদরে মাসকাবারি বাজার করতে গিয়ে রাস্তায় দেখা তার সঙ্গে।

মাস্টার, তুমি নিজেরে কী ভাবতাস? হিন্দু ভোটগুলা এক কইরা হালার পো নাসির শেখকে জিতাইলা। কামডা কি ঠিক করলা? আমারে হারাইয়া, ভাইজানের মুহে লাখ মাইরা পার পাইবা?’

তার সম্বোধন ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’তে নেমে এসেছে।

দেখুন, ঠিকভাবে কথা বলুন। আমি একটা হাই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আপনার বা নাসির শেখ, কারও হার-জিতে আমার কী আসে যায়? আমি কি পাটিফাটি করি? না কি ইলেকশানে প্রচারে রাস্তায় কখনো নেমেছি, বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি? আপনাদের তো লোক চারিদিকে, কেউ কখনো দেখেছে আমাকে এসব করতে? আগেও বলেছি, আবার আপনাকে সাফ কথা বলছি, রাজনীতি আমি করি না।

তোমারে শিক্ষা দিয়া তোমার বেবাক জাতভাইরে শিক্ষা দিমু।

মিছিমিছি ভয় দেখাতে আসবেন না। দেশে আইনকানুন আছে।

আর বেশিদিন থাকবে না আইনকানুন।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৩। ভারতের কাশ্মীরে হজরত বাল মাজার থেকে হজরত মহম্মদের মোই-ই-মুক্কাদাস বা দাড়ির একটু চুল চুরি হল। সারা পাকিস্তান পাগলা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত। দিনরাত রেডিয়ো, সভায়, পথেঘাটে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে জঘন্য গালাগালির বন্যা। আমাদের জমির চাষবাস দেখে এবং এখন বেশিরভাগ ফসলই নিয়ে যায় পুরনো ভাগচাষি হাসিম। তবে ক্ষমা ঘোষা করে রমার বেগুন আর লঙ্কার চারা কটায় হাত লাগায়, লাউ কুমড়োর লতা মাচায় কী চালে তুলে দেয়। সে-ই এক দিন আমাকে এসে বলে, “কর্তা, হাওয়া খুব গরম ঠ্যাকতাসে, আপনে, মা ঠাকরেন আর পোলামাইয়াগুলারে লইয়া কয় দিন গা ঢাকা দিন গিয়া। ঠাণ্ডা হইলে আইবেন।”

কোথায় যাব রে হাসিম, দিদিরা যে যার স্বপ্তুর বাড়িতে পাঁচ

জনের সংসারে, সেখানে পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায়? তাছাড়া তুই তো জানিস এখানেই আমার বাপ ঠাকুরদার বাস, কেন যাবে ভিটা ছেড়ে?

যা, বালো বোজেন করেন, আমার কওনের কথা কইয়া গ্যালাম।

২৯/১২/৬৩ স্কুলে নিয়ম রক্ষার্থে যাওয়া। ছাত্র কেবল শিক্ষকদের বাড়ির ক'জন ছেলে। দুপুরের দিকে অফিস যখন ফাঁকা, মৌলবি সাহেব আমার ঘরে এলেন।

সার, অ্যাকটা কথা কইতে অনুমতি দ্যান তো কই।

মৌলবি সাহেব যে, আসুন, বসুন। কত বার বলেছি আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমাকে 'সার সার' করবেন না।

আপনারে কই না। আপনার ওই চেয়ারটারে কই। উনি বসলেন না, দাঁড়িয়েই থাকলেন।

ঠিক আছে। বসবেন না। না? তাড়া আছে বুঝি? আচ্ছা, বলনু কী বলতে এসেছেন।

পরিস্থিতি বড়োই খারাপ। সব পলিটিক্স করা ইবলিশের ছা বাইর হইসে। ভয়ংকর কিসু অ্যাকটা নিচ্চয় করব। আপনে ফেমিলি লইয়া হেইখান হইতে কয়ডা দিন অন্যত্র গ্যালে বালো হয়। হেই জায়গা আপনার লগে হেক্কেরে নিরাপদ নয়। নজরদারিও জোর চলতাসে। আমি আপনারে সাবধান করতাসি হেই কথাডা পাইচ কান হইলেও বিপদ।

সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন। কেউ কিছু জানবে না। আপনি যে আমার মঙ্গল চান সেটাই আমার বড়ো প্রাপ্তি। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, এখন আসুন।

মৌলবি সাহেব ডান হাতটা আলগোছে কপালে ছুইয়ে চলে গেলেন।

৩/০১/৬৪। কাশ্মীর দিবস ঘোষণা। চারিদিকে মিটিং, ভারত বিরোধী প্রচার তুঙ্গে। স্কুল বলতে গেলে বন্ধ। স্বাভাবিক কাজকর্ম স্তব্ধ। হিন্দু এলাকা থমথমে। স্কুলের ক'জন শিক্ষক বাড়িতে এল। কীভাবে আমরা হিন্দুরা এই পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে থাকতে পারি সেই সমস্যা নিয়ে বৃথা আলোচনা। কোনো সমাধান নজরে নেই। সব ছাড়া ছাড়া বাড়ি, সকলেরই কিছু জমিজায়গা আছে। আছে পুকুর। সংখ্যাই শক্তি, একসঙ্গে অনেকে মিলে কোনো একজনের বাড়িতে থাকব? তাহলে সেই একটা বাড়িতে হামলা চালালেই সবাইকে পেয়ে যাবে। নাহ, আলাদা থাকাই ভালো। আসলে কারও বাড়িতেই তো অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। সবেধন নীলমণি একটা দুটো লাঠি সম্বল। হ্যাঁ, দা কাটারি আছে। সেগুলো হাতের কাছে রাখার প্ল্যান করা হলো। সময়মতো ব্যবহার করতে পারব কিনা সন্দেহ। কজন দা দিয়ে কবে কিছু আমরা কেটেছি? সেই স্কুলে পড়বার সময় হয়তো। বলাবলি করি। আমরা হিন্দুরা আত্মরক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতাও অর্জন করা শিক্ষার অঙ্গ বলে ভাবিনি। আজ তার

মূল্য দিতে হচ্ছে।

৪/১/৬৪ হজরতবালের পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার হলো। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত প্রমাণিত তিন জন কাশ্মীরি মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করল ভারত সরকার। উদ্ধারের খবর পাকিস্তান বিশ্বাস তো করলই না উপরন্তু মিথ্যে কথা রটিয়ে ইসলামের অপমানের জন্য যোগ্য প্রতিশোধ নিতে আহ্বান জানালো দেশের মানুষদের। অতঃপর হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা করল ইসলামিক বোর্ডের আবদুল হাই। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানেই আকাশে বাতাসে হিন্দু উৎসাদনের ডাক। স্কুল তবু চালিয়ে যাই। ক'জন শিক্ষক সঙ্গে আছে, আছে তাদের বাড়ির ছেলেরা। ক্লাসেও বসি, ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্কের টিচার অ্যালজেব্রার ফরমুলা লেখেন, ইংরেজির মাস্টার লেখেন গ্রামারের নিয়ম। সবই স্বেচ্ছ মনের জোরে। যাতায়াত করি খালি পায়ে, সাইকেল ছাড়া, কারণ আমাদের মানে হিন্দুদের পায়ে জুতো পরা বারণ হয়েছে, যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ, এমন কী ছাতা মাথায় দেওয়া চলবে না। ভাগ্যে শীতকাল, তাই বাইরে রাস্তায় বেরোতে ছাতার দরকার নেই।

গতকাল বাড়ি ফিরে দেখি রমার চেহারা কেমন ন্যাড়া লাগছে।

একি, তোমার মাথায় সিঁদুর নেই, কপালে নেই ফোঁটা। ব্যাপারটা কী?

ও সব বারণ হয়ে গেছে।

হাত দুটো এগিয়ে দেয়, ক'গছা সফ্র সোনার চুরি ঠন ঠন করছে, শাঁখা পলাও চলবে না। গুহদের বাড়ির বউ শ্যামলী এসে বলল, বউদি, শিগগির শাঁখা পলা খুলে রাখো, সিঁদুরটাও বাদ দাও, এসব চলবে না, হুকুম জারি হয়েছে।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

বাচ্চারা কোথায়?

এদিকে ওদিকে আছে আর কী। বাইরে বেরোতে তো দেওয়া হচ্ছে না।

অনি অমিকে পড়তে বসিয়েছিলে, না সময় পাওনি বোধ হয়।

সময়ের অভাব কী। রান্নার তো কিছুই প্রায় নেই। বাজার বসছে না। গাছের দুটো বেগুন আর মাচা থেকে তুলে আনা খানিকটা লাউ শাক ভরসা। দুপুরে ভাত, বেগুন পোড়া, লাউ শাক, রাতে ভাত ডাল বেগুন ভাজা। এইতো রান্না। ভাগ্যে পাঁচু নিয়মিত দুধটা দিয়ে যাচ্ছে। ক'দিন বেশি করে নিচ্ছি, দুধ মুড়ি, দুধ চিড়ে আর কত খাবে। একটু পায়স করেছি, মুখ বদলাতে।

পাঁচু গোয়ালারা পুরুষানুক্রমে আমাদের গোয়ালের কাজ করে। গোরু বাছুরকে খেতে দেওয়া, প্রতিদিন দুধ দোয়ানো, সময়মত গোরুকে পাল খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা, বাছুর হওয়ার তত্ত্বাবধান—যাবতীয় দায়িত্ব পাঁচুর। তবে গোসেবা বলে



কথা, রমারও অনেক খাটুনি পড়ত। অনির বছর পাঁচেক বয়স হলে আমরা স্থির করি গোয়ালের হ্যাপা আর রাখবো না। গোরু রাখার খরচ ও ঝামেলা, দুটো থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। পাঁচুই কিছু দিয়ে গোরুটর সব তার গোয়ালে নিয়ে গেল। তারপর থেকে নিয়মিত দুধ দিয়ে আসছে। মাস কাবারে টাকা নেয়।

গোসেবার পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বেচারার রমা হাঁপ ছেড়েছে। সময় পায় আর পাঁচটা জিনিসে মন দিতে, বইটাই পড়তে। এখন এই দুর্দিনে পাঁচুই ভরসা।

যতটা পারা যায় কাজেকর্মে থাকো, মনটা যাতে অন্যদিকে দেওয়া যায়।

ঠিক যা আশঙ্কা করেছিলাম, জেহাদের প্রথম টার্গেট খুলনা জেলা। কারণ লড়াকু মন্ত্রী জনাব জিয়াউল হাসান সাহেবের খাস তালুক। সে তো এমন একটা মণ্ডকার আশায় আশায় ছিল, খপ করে লুফে নেয়। শুনছি সারাদিন ঘুরে ঘুরে মিটিং করছে, “ভাই সব শোনেন, আমাগো নবি হজরত মহম্মদের পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন যে কাফের জাত ষড়যন্ত্র কইরা চুরি করে, আবার নকল আইন্যা রাইখ্যা মিছা কথা কয়, তাদের শাস্তি দেওন উচিত কিনা? বলেন, আপনারাই বলেন।”

শতশত কণ্ঠে জবাব, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কাফেরগুলোরে সেই শাস্তি দিবার ফরজ কার?

আমাগো, আমাগো।

ভাইসব, হক্কলরে অ্যাকটা খুশির খবর দেই, ইম্পাহানিরা আমাগো লইগ্যা হাতিয়ার জুগাইবার কসম খাইসে। ছুরি, ছোরা, দা, তরোয়াল কোনো কিসুর ত অ্যামনি অভাব নাই। উপরন্তু বন্দুক হাতে আইব। দ্যাশটারে প্রকৃত পবিত্র পাক বানাইতে হইব। কী কইরা? অ্যাকটাই উপায়, না-পাক হিন্দুরে খতম কইরা।

সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না সত্যি। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেলাম। আনসার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস তো আছেই, সঙ্গে আরও হাজার বিশেক সশস্ত্র মুসলমান রেডি হচ্ছে। তাদের জন্যই এ ধরনের ভাষণ চলেছে ৪ জানুয়ারি সারাটা দিন। এদেশে একটা আধ ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। থেকে থেকে জেগে ওঠে। বিস্ফোরণের আগে গুমগুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইবার তার মুখ থেকে নির্গত হবে লাভাস্রোত, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঘরবাড়ি মানুষজন।

৫ জানুয়ারি, ১৯৬৪। সকালবেলা, জলখাবারের পাট চুকলে রমা রান্না ঘরে দুপুরের আয়োজনে ব্যস্ত। অমি ও অনিকে শোয়ার ঘরে পড়তে বসিয়ে রমাকে বৈঠকখানায় ডাকি। এসো, বসো। জরুরি কথা আছে।

জিজ্ঞাসু মুখে রমা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বসে।

বুঝতেই পারছ কী পরিস্থিতি আর আমাদের হিন্দুদের সামনে কী ভয়ংকর বিপদ। তুমি ভালো করে মন দিয়ে শোন। আমার সঙ্গে বদলা নেবার এটা জিয়াউল, বদরুদ্দিনদের সুবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ ওরা কোনো মতেই ছাড়বে না। নির্ধাত হামলা করবে। আমি পুরুষ মানুষ, সংসারের কর্তা। আমার কর্তব্য তোমাদের নিরাপত্তা। শোনো, পশ্চিম দিকে ওই যে ঝোপঝাড় আছে, সেটা পেরিয়ে পুকুরটা, অর্ধেক কচুরি পানায় ভরে আছে। তার পরে জঙ্গলের মতো? বুঝতে পেরেছ? যেই ওদের আওয়াজ টের পাওয়া যাবে অমনি তুমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থিড়কি দিয়ে সোজা ওখানে চলে যাবে। টু শব্দটি করবে না। তুমি খুব ভালো সাঁতার কাটো, অমি, অনিও সাঁতার জানে, এক অসীম হচ্ছে সমস্যা। ওকে কোলে নিয়ে তোমার সঙ্গে আঁচলে

জাপটে বেঁধে রাখবে। দরকার হলে মুখও। আওয়াজ যেন না বেরয়। কচুরিপানা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে পারবে। একমাত্র বাঁচার উপায় জলের মধ্যে—

এসব কী বলছ কী? না না, তোমাকে বাড়িতে একা ফেলে আমি ওদের নিয়ে কোথাও পালাবো না। মরতে হয় তো সবাই একসঙ্গে মরব। তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না—রমা, রমা, শাস্ত হও। কেন বলছি বোঝার চেষ্টা কর। ওরা হয়তো আমাকে আর অসীমকে মারবে। তোমাকে, অমিকে, অনিকে মারবে না। কেন মারবে না বলে দিতে হবে? জানোনা হিন্দু মেয়েদের নিয়ে এরা কী করে? তুমি কি সেই পরিণতি চাও? সেটা কি মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর নয়?

রমা কাঁদতে শুরু করেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাথা হেলায়।

চোখের জল মোছ। মুখে হাসি রাখ। আমাদের জীবনটা তো সুখেই কেটেছে। ঈশ্বরের কথা আশীর্বাদ যেটুকু পেয়েছি সেটুকু মাথায় করে রাখি, এস।

শীতের বেলা। তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসে। ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বলে সন্ধ্যা দেয় রমা। আমি গৃহদেবতাকে প্রণাম করি। রমা গলায় আঁচল দিয়ে আমাকে প্রণাম করে। আশীর্বাদ করি, শক্তি ধরো। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, বংশের অস্তিত্ব, মানমর্যাদা ধর্ম, সব তোমার ওপর নির্ভর করছে, মনে রেখো। শোন, শুধু নিজের আর ছেলে-মেয়ের কথা ভাববে, আর কিছু নয়। পরে সুযোগ বুঝে চারিদিক দেখে, বসাক কী গুহ বা সেনেদের বাড়িতে আশ্রয় নেবে, কোনো দিবা করবে না। ওরা যে কেউ তোমাকে দেখবে।

রমা নীরবে মাথা হেলায়, হ্যাঁ।

অমি জিজ্ঞাসা করে, বাবা আজ হঠাৎ তুমি ঠাকুরঘরে এই সন্ধ্যাবেলা প্রণাম করলে? মাও তোমাকে প্রণাম করল। কেন? আরে ঠাকুরই বলো আর মানুষই বলো, প্রণামের কি অত দিনক্ষণ থাকে রে।

ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করি। অনি অমনি কাছে ঘেঁসে আসে। ওর কপালে চুমু খাই।

মায়ের কথা শুনবে। তুমি আর দিদি, দুজনে মিলে ছোটো ভাইটিকে দেখবে।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমাদের ছেড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছ। অমি অমনি ঠোঁট ফোলায়।

দূর, পাগলি মেয়ে। আমি সর্বদা তোদের সঙ্গে। তোরা দেখতে না পেলোও জেনে রাখিস আমি তোদের কাছেই আছি।

হেসে কথা ঘোরাই। তাড়াতাড়ি সবাই খাওয়াদাওয়া শেষ করে আজ শুয়ে পড়ব।

আর কি কোনো দিন আমি এই খাটাটা খুলতে পারব? লিখতে পারব চারিদিকের ঘটনা? যা লিখলাম, যাদের জন্য

লিখলাম তারা কি কোনদিন পড়ার সুযোগ পাবে?

অসীম প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছে। তারপর, তারপর কী হলো। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে। এবার শুতে যাবে। সন্তর্পণে দরজা খোলে, মায়ের আবার পাতলা ঘুম, চট করে ভেঙে যায়। এই জন্য তাঁর এত খাটা খাটুনির পর যথেষ্ট বিশ্রাম হয় না। শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। মশারিটা তুলে ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। খাতাটা এই পর্যন্ত লেখা অবধি তো বাবা বেঁচেছিলেন। মা সর্বদা বলে এসেছেন বাবা মারা যাওয়াতে কলকাতায় তারা আসতে বাধ্য হয়েছে, সেটা তাহলে এই লেখারই ঠিক পরের ঘটনা। তার মানে বদরুদ্দিনরা নিশ্চয়ই হামলা করেছিল। কী হামলা? না না, এরকম আন্দাজ করার চেষ্টা করে লাভ নেই। কী আন্দাজ করবে? মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুম, হ্যাঁ, ঘুম দরকার। সারা দিনের শ্রান্তি। আর যেন পারছে না।

আবার সেই স্বপ্নটা। ধুতিপরা লোকটাকে আবার পিছন থেকে অসীম দেখছে। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। কোপাচ্ছে আরও কোপাচ্ছে। এক জায়গাতেই কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে। কী একটা গর্ত খুঁড়ছে। চারিদিকে সেই ছায়াছায়া লোকগুলো। তাদের একজন হাত তুলে কোদাল চালানো থামাতে বলে। আর এক জন লোকটার হাত থেকে কোদালটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হঠাৎ যেন ফ্লাড লাইটের ফোকাস এসে পড়ে। কাছে কোথাও দাঁড়ি আঙুন জ্বলছে। তারই হলকায় অসীম পরিষ্কার দেখতে পায়, দুটো লুঙ্গিপরা লোক ধুতি পরা মানুষটার হাত দুটো চেপে ধরেছে, আর পাশে দাঁড়ানো পাজমাপাঞ্জাবি পরা গাট্টাগোট্টা জোয়ান লোকটা কী একটা তুলল, হ্যাঁ একটা তলোয়ার। এক হাতে তলোয়ারের হাতলটা চেপে ধরে অন্য হাতে ধুতি পরা লোকটার চুলের মুঠি ধরে

ঘ্যাচাং করে মুণ্ডটা কেটে নিল। ধড়টা সামনে পড়ে গেল। পড়ল এতক্ষণ ধরে কোপানো জায়গাটায়। হাতে রক্তাক্ত তলোয়ারটা নিয়েই অন্য হাতে চুলের মুঠি ধরা মুণ্ডটা এদিক ওদিক দোলাতে থাকে। চীৎকার করে, ‘হালা মালাউনরে দিয়া আমি তার নিজের কবর খুঁড়াইলাম। নিজের কবর খুঁড়াইলাম। হা হা হা। আর মাস্টারি করবা? মাস্টারি করবা? মাস্টারি করবা? হা হা হা, করবা? করবা? করবা? অন্ধকারে প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

ঘুম ভেঙে গেছে। অসীম ঘেমে নেয়ে একাকার, যেন আঙুন লাগা বাড়িটার ঝাঁজ তাকে গ্রাস করে রেখেছিল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তেমনই বিছানায় পড়ে থাকে। ওঠার ক্ষমতা নেই। কিছু বোধ করার ক্ষমতা নেই। কখন কাক ডাকতে শুরু করেছে। মা নিঃশব্দে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। চোখ বুজে শুয়ে আছে অসীম, জাগতে পারছে না, উঠতে পারছে না।

তবু এক সময় জাগতে হয়, উঠতে হয়।

আরও একটি দিন। আবার অফিস যাবে, টিফিন টাইমে জয়ন্তদার সঙ্গে বসবে। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান খেটেখাওয়া মানুষের ঐক্য আর লড়াইয়ের কথা শুনবে। জিয়াউল বদরুদ্দিনের চাচাতো খালাতো ভাই-বোনেরদের এ দেশের মাটিতে বসাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলবে তার নিজের ফ্ল্যাটটা।

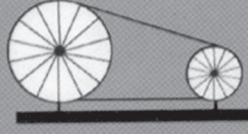
কিন্তু বাবার খাতাটা? খাতাটার কী হবে?

(কাহিনিটি কাল্পনিক। বাস্তবের কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য কাকতালীয়।)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না



স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল

বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত

দুলালের

®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে

খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা

লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি

এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান

— দারুণ কাজ দেবে।



দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি

৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩



সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বিষয়ে শিশির বসুর গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর

ডা: মধুসূদন পাল

ডা: শিশির বসুর ‘মহানিষ্ক্রমণ’ গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! ১৯৪১-এর জানুয়ারি মাসের পর প্রায় ৮৫ বছর কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত কলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনরহস্য সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ডাঃ শিশিরকুমার বসু অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ১৯৭৫-এ লিখেছেন, ‘মহানিষ্ক্রমণ’ (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) এবং এর ইংরেজি অনুবাদ ‘The Great Escape’ (Netaji Research Bureau, কলকাতা)। দুটি বই-ই একক কথন। লেখক নিজেই সব বলে গেছেন গল্পের ছলে। অজস্র অসঙ্গতিতে পূর্ণ বই দুটি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত না করে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। মহানির্গমনের সময় সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের পৈতৃক বাড়িতে ব্রিটিশ পুলিশের ঘেরাটোপে গৃহবন্দি ছিলেন।

বের হওয়ার পথ ছিল না। অথচ শিশিরবাবুর রচনায় রয়েছে একাধিক বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অসঙ্গতি। পাঠকের অবগতির জন্য সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো। পাঠক বুঝতে পারবেন, কী মিথ্যাচার করেছেন শিশির বসু।

(ক) শিশির বসুর বক্তব্য অনুসারে, মহানির্গমনের সময় তাঁর রাঙা কাকাবাবু সুভাষচন্দ্র জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশ ধারণ করলেও গাড়ি চালক শিশির ছিলেন সাধারণ পোশাকে। অর্থাৎ সতর্কতা হিসেবে তিনি কোনো ছদ্মবেশ ধারণ করার প্রয়োজন মনে করেননি। গাড়ির রং কিংবা নম্বর প্লেটও ছিল অপরিবর্তিত। অথচ ব্রিটিশ পুলিশ ফাইলে দেখা যায় যে, সুভাষচন্দ্রের অন্য ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাদের রাঙাকাকাবাবুর কোনো গোপন কাজ করার সময় যে গাড়ি ব্যবহার করতেন তার নম্বর প্লেট বারবার পরিবর্তন করতেন পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। কলকাতা পুলিশ ফাইল ২৪-এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ আছে।

(খ) মহানির্গমনের কাহিনি শিশিরবাবু এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হবে তিনিই এর প্রধান পরামর্শদাতা ও পরিকল্পক বা সবকিছুই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। অথচ সুভাষচন্দ্রের জীবনী তো ভিন্ন কথা বলে।

মনে রাখতে হবে, ‘মহানিষ্ক্ৰমণ’-এর মতো ঘটনা সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটি নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে নেতাজীর এজাতীয় অভিযানের ঘটনা আছে একাধিক। বার্লিন থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নেতাজীর জাপান যাত্রা এরকমই আর একটি দুঃসাহসিক যাত্রা। পৃথিবীখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই নেতাজীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন পরিকল্পনা, সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়েছে। সবই তাঁর নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত। বার্লিন থেকে জাপান যাত্রার সময় দেখা যায় একসঙ্গে তিনটি সমান্তরাল এবং নিখুঁত পরিকল্পনা তিনি করে রেখেছিলেন শত্রুর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। কোন্টা তিনি বেছে নেবেন বা কোন্ পথে শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে যাবেন, সেটি বোধ হয় কেবল তিনিই জানতেন। নেতাজীর সমস্ত অভিযাত্রা আজও রহস্যময়। তিনি নিজে ছাড়া কোনো পরিকল্পনার কথা পুরোপুরি কেউ জানত না।

ডাঃ শিশির বাবুর বিবরণ অনুযায়ী, রাঙা কাকাবাবু মধ্যরাত্রে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন তাঁকে ড্রাইভার হিসেবে নিয়ে। যার দীর্ঘ পথ গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা নেই, তাকে নিয়ে মধ্যরাত্রে বাড়ির গাড়িতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় এবং দ্বিতীয় কোনো সূচিস্থিত পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি বেরিয়ে যাবেন, এটা অবিশ্বাস্য। মনে রাখতে হবে, যিনি গোপন যাত্রা করছেন তিনি সুভাষচন্দ্র বসু, ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনীর ক্ষমতা সম্বন্ধে যাঁর এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

আর একটা বিষয়, বসু পরিবারের অন্যান্য সদস্য, যাঁরা শিশির বসুর বিবরণ অনুযায়ী এই অন্তর্ধান পরিকল্পনা রূপায়ণে কিছুটা

হলেও সহায়তা করেছেন, সেই ইলা বসু, দ্বিজেন বসু, অরবিন্দ বসু’র এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য না থাকাটাও কম বিস্ময়কর নয়।

ডাঃ শিশির বসুর বক্তব্য অনুসারে, উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে এলগিন রোডের বাড়িতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি গিয়েছেন এবং তাঁর রাঙা কাকাবাবুর সঙ্গে এই অন্তর্ধানের পরিকল্পনা নিয়ে শলাপরামর্শ করেছেন। অন্তর্ধানের পূর্বে এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের কাছে শিশির বসুর ঘন ঘন যাতায়াত, দীর্ঘক্ষণ থাকা, শলাপরামর্শ করা, তারপর ফিরে আসা কার্যত অসম্ভব। সমান অসম্ভব, ব্রিটিশের এক নম্বর শত্রু সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বাড়ি থেকে মধ্যরাত্রে বসু পরিবারের অতি পরিচিত গাড়িতে ‘বজ্রগর্জন’ করে পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনীর নাকের ডগার উপর দিয়ে শিশিরবাবুর বেরিয়ে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, একদল দক্ষ পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী ২৪ ঘণ্টা সতর্ক দৃষ্টি রাখত দুটি বাড়ির উপর। এদের শৈন্যদৃষ্টি এড়িয়ে একটি মাছিরও সুভাষচন্দ্রের কাছে যাওয়া-আসা কার্যত অসম্ভব ছিল। পৃথিবীখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী রাঙা কাকাবাবুর কাছে শিশিরের ঘন ঘন যাতায়াতের ব্যাপারটি খেয়াল করেনি কিংবা সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে তার সক্রিয় ভূমিকার কথা জেনে বা বুঝে উঠতে পারেনি, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সত্যি, শিশির বসু কত বোকা ভাবেন, বাঙালিকে।

মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্রের এই ‘মহানিষ্ক্ৰমণ’ কেবল ওই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোমো যাওয়া নয়। কলকাতা থেকে সুদূর কাবুল, পেশোয়ার, আফগানিস্তানের পথ ঘুরে হিন্দুকুশ পর্বত ও আমুদরিয়া নদী পেরিয়ে তিনি গিয়েছেন রাশিয়া, পরে জার্মানি, সেখান থেকে দূর প্রাচ্য জাপানে। উদ্দেশ্য, ওইসব দেশে কারও সহায়তায় সেনাবাহিনী সংগঠিত করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। ঘরে বসে অপরিণতমনস্ক শিশির বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রিটিশের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোমো পৌঁছে গেলেই নিশ্চয় সে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ ব্যাপক পরিকল্পনা। চাই প্রস্তুতি, লোকবল, সম্মিলিত ভাবনাচিন্তা, পরামর্শ, যোগাযোগ এবং ততোধিক গোপনীয়তা। অথচ শিশির বসুর বর্ণনায় এসবের লেশমাত্র ইঙ্গিত নেই। যা আছে তা শুধু শিশুসুলভ সাধারণ পরিকল্পনা করে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে যেভাবে হোক গোমো পৌঁছানো। এর থেকে একটা কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, শিশিরবাবু যদি সত্যিই কাউকে গোমো পৌঁছে দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আর যেই হোন আসল সুভাষচন্দ্র নন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই, সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে এই ‘মহানিষ্ক্ৰমণ’ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ব্রিটিশ ফাইল পাওয়া যায়নি। শুধু একটি আমেরিকান দলিলের ছোটো অংশ পাওয়া যায়। দলিলে ভারত থেকে রাসবিহারী বসু এবং এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে আলোচনা

আছে। একই ফাইলে দুই বসুর একসঙ্গে থাকাটা তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ প্রশাসনের বানু গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে সফলভাবে পালিয়ে যেতে ব্রিটিশ ইতিহাসে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিপ্লবী পারেননি। ব্যতিক্রম এই দু'জন। একই দলিলে তাই রাসবিহারী-সুভাষচন্দ্রের নাম একসঙ্গে থাকাটা এই দুই কাহিনির মধ্যে কিছু যোগসূত্রেরই ইঙ্গিত দেয়। এই দলিলের বর্ণনা অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একদিন কোনো এক দাড়ি-গোঁফ সমন্বিত শাদ্দুল সিংহ কবিশের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এলগিন রোডের বাড়িতে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর শাদ্দুল সিংহ এবং পরে দাড়ি কামানো এক সুবেশ তরুণ বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর শাদ্দুল সিংহ এবং পরে দাড়ি কামানো এক সুবেশ তরুণ বেরিয়ে গেলেন। অনুমান, প্রথমে শাদ্দুল

সিংহের ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র, পরে প্রকৃত শাদ্দুল সিংহ দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে বেরিয়ে যান। সে সময়ে তাদের কেউ চিনতে পারেনি। এদের সম্পর্কে কেউ সামান্যতম সন্দেহও করেনি।

সুভাষচন্দ্রের এই অন্তর্ধান পর্বে ফজলুল হক এবং কলকাতার তৎকালীন মেয়রের সহযোগিতার কথা শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, সুভাষচন্দ্র কলকাতার কোনো এক বড়ো পুলিশ অফিসারের সহায়তায় তারই গাড়িতে চড়ে বানু গোয়েন্দাদের সতর্ক চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হন। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে কলকাতা পুলিশের উপর মহলে সুভাষচন্দ্র অনুরাগী কিছু অফিসার ছিলেন। উপরতলায় পুলিশের একটা অংশ যেমন ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত তেমনি একটা ছোট অংশ ছিল বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের অনুগত। সেটাই তিনি কাজে লাগিয়ে স্নেহের সুভাষকে ঝুঁকিপূর্ণ গোপন অভিযানে সহযোগিতা করেছিলেন। সেই কারণেই এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ব্রিটিশ সরকার ফজলুল হককে পদচ্যুত করে। আর একটি মত, ব্রিটিশের চোখকে ঝাঁকি দিয়ে কলকাতা থেকে একটি জাহাজে সুন্দরবন হয়ে তিনি অন্তর্ধান করেন।

(গ) শিশির বসু লিখেছেন, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন ১৯৪৪-এ। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের তিন বছর পরে। কথা হলো, নিষ্ক্রমণের ব্যাপারে সত্য সত্যই তার সহযোগিতা

অনেকের অনুমান, সুভাষচন্দ্র
এসময় কবিকে
জানিয়েছিলেন, দেশের
স্বাধীনতার স্বার্থে যদি তাঁকে
গোপনে দেশ ত্যাগ করে
রাশিয়া, জার্মানি বা জাপান
যেতে হয় সেক্ষেত্রে
যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে
কবি যেন তাঁকে সহযোগিতা
করেন। বিষয়টি খুবই
গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়
বলেই দু'জনের একান্তে
একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুগামী হওয়ার থেকেও ব্রিটিশের চোখে অনেক বড়ো অপরাধ, সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশের বেড়া জাল থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করা। শিশিরকুমার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলে ব্রিটিশ প্রশাসন নিশ্চয়ই তাকে অন্তর্ধানের পরে পরেই সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করত।

(ঘ) শিশির বসু তার রাঙা কাকাবাবুকে এতবড়ো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে এতটাই সহযোগিতা করেছিলেন যে, মহানিষ্ক্রমণের তারিখটাই সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। তাই তার গ্রন্থে নিষ্ক্রমণের তারিখ একবার ১৬ জানুয়ারি আর একবার ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ লিখেছেন। ধানবাদে পৌঁছানোর সময় নিয়েও সংশয় আছে।

শিশির বসুর বক্তব্য, এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরের ভোরেই ধানবাদে তার দাদা ডাঃ অশোক নাথ বসুর বাড়িতে তারা পৌঁছে গেছিলেন। এদিকে অশোক নাথ বসু নিজে লিখছেন, ভাই শিশির ‘রাঙা কাকাবাবুকে’ নিয়ে ১৮ তারিখ ভোরে তার কাছে পৌঁছেছেন।

দুর্ভাগ্য, বিগত চার দশক ধরে দেশবাসী সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমন সম্পর্কে শিশিরকুমারের গল্পকথাকে মান্যতা দিয়ে গেছেন নির্দিধায়। কারণ, তারাও অসহায়। মহানির্গমন সম্পর্কে একমাত্র শিশির বসু ছাড়া সুভাষচন্দ্রের নিকট সঙ্গী সাথীরা কেউ কোনো বিবৃতি দেননি। শিশির বসুও স্বীকার করেছেন, সুভাষচন্দ্রের

থাকলে পুলিশ নিশ্চয়ই আসল মাথাটিকে এত পরে গ্রেপ্তার করত না। কারণ, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ অনেককেই গ্রেপ্তার করেছিল ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আসলে শিশির বসুর গ্রেপ্তারের পিছনে ছিল অন্য কারণ। শিশিরকে যে ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, Notification No. IV/4/43-M.S. Date, New Delhi, 7th November, 1944, Section 7 of the Restriction and Detention Ordinance, 1944 (111 of 1944) ধারায়। উল্লেখ্য, এই ধারায় সেই সময় নেতাজী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের শতশত অনুগামীদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বন্দি করে রেখেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। শিশির বসু রচিত এই দু'টি গ্রন্থের কোথাও লেখা হয়নি যে, তাকে (শিশির বসুকে) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনে সাহায্য করার অপরাধে। কারণ,

মহানির্গমনে সহযোগিতা করা নিয়ে ভাব ভূমিকার কথা কোথাও কেউ লিখে রাখেননি। প্রশ্ন, ঘটনার ৩৪ বছর পরে হঠাৎই ১৯৭৫-এ তার মনে পড়ে গেল আর তিনি গুছিয়ে সবকিছু লিখে ফেললেন?

একটা কথা, মহানির্গমনের তারিখ নিয়ে বসু পরিবারের অন্য সদস্যরা এ বিষয়ে বাইরে (সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দান ও গ্রন্থ রচনা) কোনো বিবৃতি দেননি। সুভাষচন্দ্রের অপর ভ্রাতৃপুত্র প্রদীপকুমার ৯.৪.১৯৭৩-এ কলকাতায় জাস্টিস খোসলা কমিশনে তাঁর সাক্ষ্য এবং জেরার সময়ে কী বলেছেন সেটা দেখা নেওয়া যাক,

“The pattern of his escape was that he came to the conclusion that once it was known that he had left and if everybody in the family pretended that nobody knew where he had gone, then many of them would be arrested. So, he planned that my elder brother Aurobindo Bose who was supposed to go everyday to him would announce that Netaji would not meet anybody else and then although he left on 12th January night the fact was announced on 26th January....

Shri Sisir Bose has recently published the story but Aurobindo has never published any statement. I should personally think that it is a very interesting question of integrity. (Ref. Deposition of Pradip Kumar Bose, Nephew of Netaji, before Netaji Inquiry Commission 1970, Records XVI, P. No. - 4518-4549, dated on 9.4.1973) অর্থাৎ শিশির বসুর বইয়ে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রদীপ কুমার বসুর সংশয় আছে।

এবারে একটি দলিলের (পার্লামেন্টের ধারা বিবরণী, লোকসভা আগস্ট ৩, ১৯৭৭, বক্তা শশাঙ্কশেখর সান্যাল, সাংসদন, জঙ্গিপুুর) মর্মার্থ উল্লেখ করা যাক—

“.....নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি এটাই চরম সত্য।আমি তাঁর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে শেষ কথা বলেছি ৩ তারিখে (৩.১.১৯৪১)। তাঁর মহানির্গমন ১৩ তারিখে (১৩ জানুয়ারি, ১৯৪১)। আমি ভণিতা করছি না যে, তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনি আমি জানি। আমি জানতাম, সে অসাধারণ কিছু করতে চলেছে। সেই সময় সে আমাকে অতি গোপনীয় কিছু কথা বলেছিল। সেসব.....প্রকাশের অনুমতি নেই। সেসব প্রকাশের আগে তার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি প্রয়োজন। আমি সেই অনুমতি আসার অপেক্ষায় আছি।

অন্তর্ধান : রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সম্পর্কে বহু সত্য মিথ্যা কাহিনি প্রচলিত আছে। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, মহানির্গমনের পূর্বে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রিয় দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের একান্ত সাক্ষাৎ অথবা পত্রবিনিময় হয়েছিল কিনা?

সুভাষচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায়, মহানির্গমনের পূর্বে তিনি উদ্গ্রীব ছিলেন কবিগুরুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের। কবিগুরু

তখন প্রচণ্ড অসুস্থ। কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র।

“শ্রদ্ধাভাজনেষু,

গুরুদেবের অসুখের সময় থেকেই ভাবিতেছি আপনাকে চিঠি লিখি। সে সময়ে আমি জেলখানায় এবং আপনারা তাঁর অসুখ লইয়া খুবই বিব্রত। তারপর গুরুদেবের কতকটা আরোগ্য হইবার পরেই আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং অসুস্থ অবস্থায় অনশন আরম্ভ করিতে বাধ্য হই। বাড়ি ফিরিয়া প্রত্যহই ভাবিতেছি আপনাকে লিখি—শেষে আজ সংকল্প করিয়া লিখিতে বসিলাম।

—গুরুদেবের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনি নিজে কেমন আছেন?

আমার শরীর পূর্ব অপেক্ষা ভালো—তবে কতকগুলি গ্লানি এখনও আছে। বোধ হয় স্বস্থানে শীঘ্রই ফিরিয়া যাইতে হবে—

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

সুভাষচন্দ্র বসু”

আসলে, এই চিঠিটি লিখেছিলেন গুরুদেবকেই। প্রণাম জানিয়েছিলেন তাঁকেই। এইটি গুরুদেবের কাছে সুভাষচন্দ্রের শেষ চিঠি, শেষ প্রণাম। ছোট্ট চিঠিটির মধ্যে অলিখিত রয়ে গেছে অনেক কথা। যে কথা কবি হৃদয় দিয়ে উদ্ভিগ্ন মন নিয়ে অনুভব করলেন কয়েকদিন পরেই। “কী উদ্দেশ্যে কেন গুরুদেবের আশীর্বাণীর আকাঙ্ক্ষা ছিল চির-বিদ্রোহী সুভাষের তাও বুঝতে পারলেন গুরুদেব। হয়তো সেদিন গুরুদেব সমস্ত অন্তর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরম আশীর্বাণী অজানা পথচিহ্নের অশান্ত ভারত-পথিককে—তাঁর একান্ত স্নেহের সুভাষকে।”

অপ্রকাশ্য বা অপ্রত্যক্ষভাবে এসম্পর্কে কিছু সূত্র জানা যাচ্ছে, অনুগামীদের কলমে ‘মহাকাল’-এর ‘ভগবানজী কথা’ থেকে। সেখানে লেখা আছে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে গভীর রাত্রিতে। মহাকাল অনুগামী তাঁর ৫ মে ১৯৭৩ (পৃ. ২৩)-এ লিখছেন, “শেষ দেখা আমার কবিগুরুর সঙ্গে গভীর রাত্রিতে—কেউ জানে না। আমার রওনা হওয়ার শেষ পাথেয় এবং আশীর্বাদ তিনিই পাঠান।....” (এটা মহাকালের মুখের কথা, যা অনুগামীর ডায়েরিতে লিখিত হয়েছে।)

উভয়ের সম্পর্কের খতিয়ান বুঝতে আর একটু পিছনের কথায় আসা যাক। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কবি বোলপুর থেকে মেদিনীপুর চলেছেন—বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামার পর কবির জন্য সংরক্ষিত বিশেষ কামরায় দু’জনের একান্ত কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার বিষয় নিয়ে দু’জনের কেউ কোনো কথা প্রকাশ করেননি। এরপর দু’জনের গোপন আলোচনা হয় ১ জুলাই ১৯৪০ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সম্ভবত, আলোচনা হয়েছিল ভবিষ্যতের কোনো একটি বিষয় নিয়ে

যা তৃতীয় জনের কাছে প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেননি। অনেকের অনুমান, সুভাষচন্দ্র এসময় কবিকে জানিয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে যদি তাঁকে গোপনে দেশ ত্যাগ করে রাশিয়া, জার্মানি বা জাপান যেতে হয় সেক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কবি যেন তাঁকে সহযোগিতা করেন। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় বলেই দু'জনের একান্তে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের বহুল যোগাযোগ ছিল। শান্তিনিকেতনে “Quite a large number of persons appointed by Rabindranath were ex-detenués and prominent Anushilan members” (Santiniketan-A phase of Tagore's association with revolutionaries by Sukumar Sarkar), অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় সুভাষচন্দ্রের আরও বৃহৎ কোনো সুপরিকল্পিত নিরাপদ অন্তর্ধান পরিকল্পনা বা তার রূপায়ণ অসম্ভব ছিল না। বরং সেরকমই কিছু ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে। ‘বদনাম’ গল্পটি হয়তো কবি সেই আবেগ থেকেই লিখেছিলেন।

‘বদনাম’ গল্পটি প্রকাশিত হয় মে ১৫—২২, ১৯৪১। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ৪ মাস পরে। গল্পটি পড়লে মনে হবে, কবিগুরু প্রিয় সুভাষের এই অন্তর্ধানের কথা শুধু জানতেন না তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় অংশীদারও। ‘বদনাম’ গল্পের নায়িকা পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয়বাবুর স্ত্রী সদু না সৌদামিনী, বিপ্লবী নেতা অনিল মিত্র—সবই যেন বাস্তব।

সমালোচকদের মতে, বিপ্লবী অনিল চরিত্রের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের ছায়াপাত স্পষ্ট। ‘বদনাম’ ছোটগল্পের রহস্য বিশ্লেষণ করলেই সমালোচকদের অনুমানের সারবত্তা প্রমাণ হয়ে যাবে,

(ক) এর মধ্যে আছে, সুভাষচন্দ্রের ১৯৪১-এর রহস্যময় গোপন অভিযাত্রার পরিকল্পনার ছায়া। আছে, সুভাষচন্দ্রের এই রহস্যময় যাত্রায় কবিগুরু নিজের সক্রিয় সহযোগিতার ইঙ্গিত।

(খ) বিপ্লবী অনিল মিত্রের চরিত্রের বর্ণনার মধ্যে কবি যেন সুভাষচন্দ্রের আফগানিস্তানের দিকে যাত্রার গোপন ইতিহাস নথিভুক্ত করেছেন।

(গ) অন্তর্ধানের পিছনে বঙ্গপ্রদেশের পুলিশের একাংশের যে সহযোগিতা ছিল পরে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। রবীন্দ্র সমালোচকদের মতে, বিপ্লবী অনিলের কথার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রের গোপন পরিকল্পনার কথাই প্রকাশ করে দিয়েছেন কবি—

‘আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি / তোদের আছে।’

হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইনস্পেক্টরবাবু।

‘এই গান অনেকবার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্তানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক।’.....

সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৪৭, জানুয়ারি ২৭, ১৯৪১ সংস্করণে। সংবাদের শিরোনাম—

‘শ্রীযুতঃ সুভাষচন্দ্র বসু অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ’

ওইদিনে প্রকাশিত হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সংবাদ শিরোনাম—

“WHAT HAS HAPPEND TO S.J.

SUBHAS CH. BOSE

Unexpected Exit from Home”

যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অক্ষের ভাষায় কোনো বক্তব্য নেই। অথচ ‘বদনাম’ গল্পে তিনি কথা বলেছেন অক্ষের ভাষায়। ‘১৫ দিন’ শব্দবন্ধের ব্যবহার কবির খামখেয়ালিপনা নয়। অনিল মিত্রের তাহলে কবে আফগানিস্তানের পথে যাত্রা করেছে? খবরে প্রকাশ ২৭.১.১৯৪১। ১৫ দিনের ব্যবধানে খবর বেরিয়েছে, তাহলে নির্গমনের তারিখটা হবে ১২ জানুয়ারি। আর যদি বলা যায় ১৫তম দিনে বেরিয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট তারিখ হবে ১৩ জানুয়ারি? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথায়, অনিল মিত্রের নির্গমন এবং সংবাদটি খবরের কাগজে প্রকাশের ব্যবধান ১৫ দিন। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুভাষচন্দ্র ১২ জানুয়ারি ১৯৪১ মধ্যরাত্রে কিংবা ১৩ জানুয়ারি ১৯৪১-এ বেরিয়ে গেছেন। ১৯৭২ সালে সুনীল দাস ও বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বস্তু, ১৯৭৩-এ ভ্রাতৃস্পুত্র প্রদীপকুমার বসু এবং ১৯৭৭-এ মহানির্গমন বিষয়ে মুখ খুলেছেন বিপ্লবী, ব্যারিস্টার তথা নেতাজীর অনুচর শশাঙ্কশেখর সান্যাল। অপ্রত্যাশিতভাবে এবিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেছেন কবিগুরু স্বয়ং। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু তাঁর দেহাবসানের কয়েক মাস পূর্বে ‘বদনাম’ ছোটগল্পে প্রিয় সুভাষের মহানির্গমন সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ যে তথ্য দিয়েছেন তা শিশির বসুর দেওয়া মহানির্গমন সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ যে তথ্য দিয়েছেন তা শিশির বসুর দেওয়া মহানির্গমনের তারিখ এবং তার ভূমিকা যে মিথ্যা সেকথাই প্রমাণ করে। এই চারজন নিশ্চয়ই ১৯৪১-এর পর চক্রান্ত করে এই অসত্যভাষণ দেননি।

*লেখকের বই ‘বিচিত্রা’ (জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট, কলকাতা) গ্রন্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের মূল নথিগুলি মুদ্রিত।



SHREE
जंग रोधक
CEMENT

**घर की ढाल,
सालों साल**



Delhi Corporate & Marketing Office: Epitome, Building 5, 9th Floor, DLF Cyber City, Block-B, Gurugram - 122002.
Tel: +91-124-4699200

Kolkata Corporate Office: 21, Strand Road, Kolkata - 700001. | Tel: +91-33-2230 9601-04

www.shreecement.com

श्रुतिका - पूजा संध्या ॥ १४७२ ॥ १५८



টেরর স্টেট

পাকিস্তানের এটাই এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ইমেজ

সুজিত রায়

সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের জঙ্গিবাহিনীর হামলায় এখনও পর্যন্ত মূলত ভারতবর্ষে কত সংখ্যক প্রাণহানি ঘটেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান নিজেও দিতে পারবে না। কারণ হত্যা, সন্ত্রাস, অত্যাচার ও ধর্ষণে পেশাদারী দেশ ধারাবাহিকভাবে অপরাধ করেই চলে। কোনো হিসাব থাকে না তার।

গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স অনুযায়ী—শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই পাকিস্তানি সন্ত্রাসী হামলায় মোট হত্যার শিকার ১০৮১ জন যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৪৫ শতাংশ বেশি। এই ইনডেক্সেই দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে পাক-সন্ত্রাসী হামলার মোট সংখ্যা ছিল ৫১৭। হত্যার সংখ্যা ছিল ৭৪৮। বাড়তে বাড়তে বছর ঘুরতেই তা হাজার পার। ফলত গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৫ রিপোর্টে পাকিস্তানকে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক সন্ত্রাসবাদ প্রভাবিত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গোটা বিশ্বের চোখে একটি নিন্দিত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরেও পাকিস্তান সরকার এবং মোল্লাবাদী নাগরিকরা সন্ত্রাসকে বিসর্জন দেয়নি। সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হলো—পাকিস্তান তার ১৯৩০-এর দশকের ভারত বিদ্বেষী

মনোভাবকেই আজও প্রাধান্য দিয়ে চলেছে এবং গত ৭৫ বছর ধরে পৃথক দেশ গঠনের সময় থেকেই ক্রমাগত আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের শেষ পাদানিতে পৌঁছেও এই অন্যতম ভারত-বিদ্বেষী ইসলামিক স্টেট পাক-ই-স্তান অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র ভূমি থেকে পাকিস্তান অর্থাৎ সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে পরিণত হওয়া দেশটি সন্ত্রাসের পথেই পা বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে।

কেন এই ভারত বিদ্বেষ, সে প্রশ্নের বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়ার আগে আসুন দেখে নিই—গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৫ রিপোর্টে ঠিক কী কী বলা হয়েছে—গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্সে সামগ্রিকভাবে ১৬৩টি দেশকে স্ক্যানারের অধীনে আনা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস মূলত সন্ত্রাসবাদ ট্র্যাকার ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে যে সামগ্রিক তথ্যের সন্ত্রাস মজুত করেছে, জিটিআই রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে সেই তথ্যকেই ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে।

এই রিপোর্টে স্পষ্টতই দাবি করা হয়েছে—সবচেয়ে সর্বনাশা সন্ত্রাসবাদের প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়েছে ইসলামিক মোল্লাবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেট বা আইএস নামে বহুল পরিচিত। যদিও এই আইএস-এর ৭১ শতাংশ কার্যকলাপ সিরিয়া এবং ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো বা ডিআরসিতেই সীমাবদ্ধ তবুও আইএসের কার্যকলাপের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক দেশ হলো পাকিস্তান। সাব-সাহারান আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল হলো সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রভূমি যা মূলত আইএসের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। ইসলামিক স্টেট সংগঠনটির নেতৃত্ব থেকে গুপ্তচর এবং গুপ্ত ঘাতকবাহিনীর অবাধ অনুপ্রবেশকে স্বাধিকার দিয়ে রেখেছে পাকিস্তান। ফলত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পাকিস্তানই হলো আইএস-এর অন্যতম মূল ঘাঁটি যেখান থেকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদী হানা হয়ে চলেছে সেই ২০০০ সাল থেকেই, অবিরাম।

এমনকী পাকিস্তানের মদতেই আফগানিস্তানের মাটিতেই ডানা মেলেছে তালিবানি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান। এরাও প্রত্যক্ষভাবে আইএস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাসের নয়া জামানার জন্ম দিয়েছে শাস্ত্রপ্রিয় আফগানিস্তানের মাটিতে। এক সময়ে মধ্যপ্রাচ্য ছিল আইএসের ঘাঁটি। এখন মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ—ইরাক, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক চাপে তারা সরে গেছে সাহেলে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মৃত্যু কমেনি বরং বিশ্ব মানচিত্রে এই হামলা ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে সামগ্রিকভাবে ২২ শতাংশ। রিপোর্টে স্পষ্টতই দাবি করা হয়েছে—সন্ত্রাসবাদের প্রভাব ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে এবং সন্ত্রাসবাদী হানা এতটাই তীব্র হয়ে উঠছে যে, ২০২৩ সালে সন্ত্রাসবাদে মৃত্যুর শিকারের ৮৭ শতাংশই ঘটে গেছে মাত্র দশটি দেশে। আইএস হানা দিয়েছে ২১টি দেশে। সঙ্গে মদত দিয়েছে বোকা হারাম ও ছথিদের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিও।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ

পাকিস্তানের সন্ত্রাসী মনোভাব স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্তত ১৭ বছর আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন তৎকালীন মুসলমান নেতৃত্ব এবং মুসলিম লিগ মূলত স্বধর্ম ও স্বাভাৱ্যভিমানকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে সনাতন ধর্মের অনুকূল হিন্দু ভারতবর্ষের পাশেই একটি ইসলামিক দেশ গঠনের জন্য আন্দোলনের নামে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাঠ আমরা অবশ্যই নেব। কিন্তু পাকিস্তানের স্বাধীন সরকার পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের শিকড় ছড়ায় মূলত ১৯৭৯ সালের পর থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে যখন আফগানিস্তান দখল করে তখন সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান আফগান মুজাহিদিনদের সমর্থন করার পর থেকেই পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়। এই মুজাহিদিন যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনী সিআইএ এবং পশ্চিম দেশগুলির গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। তখন থেকেই মোল্লাবাদী ইসলামিক নেতৃত্ব তথা ধর্মীয় নেতারা ধর্মের আড়ালে জঙ্গিবাদকে প্রশয় দিতে শুরু করে। শিক্ষার নামে মাদ্রাসা ও খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে কিশোর প্রজন্মকে হিন্দু বিদ্বেষের প্রচারে জারিত করে গড়ে তোলে সামাজিক স্তরের জঙ্গি বাহিনী। সাম্প্রদায়িক মোল্লাবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত মানুষজন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক তাগিদ বেড়ে ফেলে হাতে তুলে নেয় আন্তর্জাতিক মানের মারণাস্ত্র। একেবারে সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের তকমাধারী হিসেবে। এই সময় থেকেই জঙ্গি বাহিনীগুলি ধীরে আইএস নিয়ন্ত্রিত শাখা জঙ্গি সংগঠনের চেহারা নেয়। পাকিস্তানের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, গভীর জঙ্গলের সামরিক ডেরায়, গড়ে বাসা বাঁধে সন্ত্রাসের উইপোকা। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা পাকিস্তানে এমনকী পাক অধিকৃত আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের একাংশেও।

পাকিস্তানের এই সন্ত্রাসবাদমুখী পরিচিতিটা এতদিন মুখোশের আড়ালে থাকলেও, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের টুইন টাওয়ারের নারকীয় সন্ত্রাসী হামলার পর। এই ঘটনা গোটা বিশ্বকে সচকিত করে তোলে যা অচিরেই বিশ্ব সন্ত্রাসী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। আফগানিস্তান ও ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি পাকিস্তানের বিদেশনীতি একটি বিপজ্জনক ইউটার্ন নেয়। একদিকে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মোল্লাবাদী সন্ত্রাসী জনগণ যেমন শিয়া, সুফি, আহমেদিয়ার মতো সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে খজ্জাহস্ত হয়ে ওঠে, তেমনি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ইস্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স সামরিক বাহিনী এবং স্বঘোষিত ইসলামিক মজহবি নেতাদের একটি অপবিত্র জোট জম্মু ও কাশ্মীর ভূখণ্ডকে লক্ষ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদের হানাভূমিতে পরিণত করে। এই জঙ্গি জোটের সঙ্গে হাত মেলায় কাশ্মীরের বসবাসকারী ভারতীয় জেহাদি মুসলমানরা যারা কাশ্মীরের

স্বাধীনতার ধূয়ো তুলে জন্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের চারণভূমি করে তুলতে চেয়েছিল। এই জেহাদি বাহিনীগুলি আসলে পাকিস্তানের জিহাদি গোষ্ঠী আহলে হাদিস, দেওবন্দি জামায়াত-ই-ইসলামি-সহ নানা গোষ্ঠীর বিস্তারিত অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল।

জেহাদি প্রশিক্ষণের রণভূমি পাকিস্তান

জেহাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ছয়টি ধাপে।

তাসিস : এই পর্বে প্রশিক্ষণরত তরুণ প্রজন্মকে মজহবি ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত করা হয়। এই পর্বে শেখানো হয় ইসলাম হলো বিশ্বের পবিত্রতম মজহবী এবং কোরান হলো পবিত্রতম মজহবি গ্রন্থ। সেরা শত্রু হলো বিধর্মী হিন্দুরা যারা ইসলাম ও কোরানের বিরোধিতা করে। গোমাংস ভক্ষণকে ঘৃণা করে। একাধিক বিবাহ ও তালাক পদ্ধতির অপসারণ দাবি করে ও মহিলাদের পর্দানাশিন না থেকে প্রকাশ্যে মেলামেশায় অনুপ্রাণিত করে। এরা কাফের, এদের মুণ্ডচ্ছেদ করাই হলো শ্রেষ্ঠ শাস্তি। এই প্রশিক্ষণ চলে এক মাস।

আল-বাদ : এই প্রশিক্ষণ চলে তিন মাস। এই পর্যায়ে প্রশিক্ষণরত জেহাদিদের শারীরিক ও মানসিক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে চলে সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পরবর্তী ছ মাস ধরে চলে গেরিলা প্রশিক্ষণ

দোশতা : সাত থেকে দশদিনের এই প্রশিক্ষণে অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হয়।

জান্দালা : এই পর্বে নয় মাস ধরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহার এবং বিস্ফোরক তৈরি করতে শেখানো হয়। তবে দোশতা ও জান্দালা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সব শিক্ষার্থী পায় না। এর জন্য বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক বল এবং ইসলামিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারে তাদেরই দোশতা বা জান্দালা পর্বে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও আছে জোমেলা প্রশিক্ষণ অর্থাৎ কাঁধে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র রেখে আক্রমণের প্রক্রিয়া। আছে জাকাজাকও প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণে ট্যাঙ্ক, কামান বা অন্যান্য ভারী অস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। তবে এই শেষ দুটি প্রশিক্ষণ দিতে গেলে সেনাবাহিনীর সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি যেমন লস্কর-ই-তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন এবং হরকাতুল জেহাদ-ই-ইসলামির মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পাকসেনার কাছ থেকেই এই প্রশিক্ষণগুলি নিয়ে থাকে। এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে পাকিস্তানে জঙ্গি সন্ত্রাসে সরকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই ভারতের ওপর পাকিস্তানের সমস্ত জঙ্গি হানাকেই স্টেট স্পনসর্ড ক্রাইম হিসেবেই দাবি করা হয়ে থাকে।

পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি বাহিনী

তালিবান, জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা বা লস্কর-ই-বাংভির মত অতি সুপরিচিত জঙ্গি সংগঠনগুলি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে অবস্থান করলেও এই গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্য

একটাই, বিশ্বজুড়ে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজে তাদের প্রধান সহায়ক শক্তি ইসলামিক স্টেট এবং ইন্টার স্টেট ইনটেলিজেন্স। এদের মাধ্যমে পাক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির যেমন আল কায়েদা, তালেবান, জামায়াত-ই-ইসলামি, হিজবুল মুজাহিদিন ইত্যাদির।

এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আল কায়েদাই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড়। আল কায়েদার অবিসংবাদিত নেতা ওসামা-বিন-লাদেন আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আশ্রয় নিয়েছিল পাকিস্তানেই পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। আল কায়েদার রয়েছে একটি পাকিস্তানি শাখাও যারা পাকিস্তানি, তালিবান, জইশ-ই-মহম্মদ বা লস্কর-ই-তৈবার মত দেওবন্দি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাসী হানার পরিকল্পনা করে। ইন্টারনেট বা আন্তর্জাতিক সম্প্রচার নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে আল কায়েদা আন্তর্জাতিক জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে। সংগঠনের হিংস্রতা এতটাই এবং এদের আন্তর্জাতিক স্তরে জঙ্গি দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এতটাই মজবুত যে আল কায়েদা আত্মঘাতী ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি বিস্ফোরণ, অপহরণ, লাইভ ভিডিও সম্প্রচার করে মানুষের ধড় ও মুণ্ডু আলাদা করে দেওয়া এবং রকেট লঞ্চর ব্যবহার করার মতো প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে। আজ যখন পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে গোটা বিশ্বের নজরে ঘৃণিত, তখনও সে যখন ভারতের মতো শক্তিশালী দেশকে চোখ রাঙায়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না—পাকিস্তান নিজের যোগ্যতায় কথা বলছে না—বলছে আল কায়েদার মতো নৃশংস পশুসম একটি সন্ত্রাসবাদী ইসলামিক গোষ্ঠীর মদতেই।

আল কায়েদার পাশাপাশি রয়েছে তালেবান-এর পাকিস্তানি শাখাও। তালিবান সংগঠনটির উত্থান ঘটেছিল ৯।১১-র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পর আফগানিস্তানের খাইবার পাখতুনখোওয়া প্রদেশের কিছু অংশে এবং পাকিস্তানের ফেডারেলি অ্যাডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়াস (FATA) অঞ্চলে। প্রাথমিকভাবে তালেবানের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা এবং আফগানিস্তানের দখল নেওয়া। কিন্তু অচিরেই এই মারাত্মক ধরনের নারীবিরোধী এবং নারীর অধিকার হরণকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীই ইসলামিক অ্যাজেন্ডাকেই আঁকড়ে ধরে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামিক সন্ত্রাস কায়েমের ডাক দেয়। আসলে এই আফগান তালিবানদের উৎস হলো দেওবন্দি গোষ্ঠীই। সোভিয়েতের সঙ্গে আফগানের যুদ্ধে আফগান মুজাহিদিনরা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানি মুজাহিদিনদের পঞ্জাবি মুজাহিদিন বলেই চিহ্নিত করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পঞ্জাব মুজাহিদিনরা জন্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস কায়েম করলো, তখন তাদের পরিচয় হয়ে গেল আফগান মুজাহিদিন। আবার একই সময়ে পাকিস্তানি তালিবানদের বলা হতো পঞ্জাব তালিবান। আসলে এই

সমস্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, সন্ত্রাসবাদের কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই। সব তালিবান, সব মুজাহিদিন, সব জইশ, সব লস্করই আসলে ইসলামিক স্টেট-এর তাঁবেদার। তারা সকলেই একটি তত্ত্বে বিশ্বাসী---বিশ্ব শাসনের মহান দায়িত্ব আল্লাতালার শুধু মুসলমানদেরই দিয়েছে। সমগ্র মুসলমান সমাজের স্বার্থে তাই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসের আঁধার কায়ম করতে চায়—অন্ধেরা কায়ম হায়, অন্ধেরা কায়ম রহেগা।

মুসলমান গবেষক এবং সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল আলা মুওজুদি জামায়াত-ই-ইসলামির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে। দলের মূল নীতি ছিল—বিশ্বের প্রাথমিক সংগ্রাম হলো ইসলাম, যা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফলত, জামায়াতের কাছে পুঁজিবাদ, উদারনীতি, সেকুলারিজমের মতো শব্দগুলি ছিল বিষের মত অসুয়া। দল চেয়েছিল, পাকিস্তানে শরিয়ত আইন মোতাবেক ইসলামি দেশ স্থাপিত হোক। তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে—পাশাপাশি জামায়েত আরও একটি অলিখিত স্বপ্ন পূরণ করেছে—তাহলো একটি নৃশংস সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া। এই জঙ্গি গোষ্ঠীটিই ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজাকার যোদ্ধার বেশে বাঙ্গালি তথা হিন্দু জনগণের গণহত্যা অংশ নিয়েছিল এবং তারা এ ব্যাপারে পাক সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তা উপভোগ করেছিল। পাকিস্তানে জিয়া-উল-হকের শাসনকালে জামায়াতের রাজাকার যোদ্ধাদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাও সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে—পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের জনক ও পালক আসলে পাকিস্তানের সরকার। হিজবুল মুজাহিদিন মূলত জামায়াত-ই-ইসলামিরই একটি জঙ্গি গোষ্ঠী যারা জন্ম ও কাশ্মীরে জেহাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে বা দিয়ে চলেছে। হিজবুল মুজাহিদিনের প্রতিষ্ঠাতা হলো কাশ্মীরের এক স্কুল শিক্ষক মুহাম্মদ আহসান দার। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর ও জন্মকে ছিনিয়ে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এই সংগঠনের নেপথ্যে রয়েছে কাশ্মীরের কিছু স্বার্থাশ্রয়ী কাশ্মীরি ও অকাশ্মীরি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি। দক্ষিণ এশিয়ান জেহাদি গোষ্ঠীর আদর্শ শীর্ষক রচনার লেখক হুসেন হাক্কানির মতে—হিজবুল মুজাহিদিনের সাহিত্য ও শিক্ষার বেশিরভাগই জেহাদের প্রায় স্থায়ী অবস্থাকে সমর্থন করে এবং বিস্তৃত পরিভাষায় সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডকে মুসলিম পুনর্বিজয়ের বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করে। সমস্ত পাক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গেই হিজবুল মুজাহিদিন সমর্থনের সংখ্যাও অনেক। মাদ্রাসা শিক্ষার মুজাহিদিনের সমর্থনের সংখ্যাও অনেক। মাদ্রাসা শিক্ষার পরিচালনায় হিজবুলের গভীর নিয়ন্ত্রণ। যদিও বর্তমানে হিজবুল মুজাহিদিন আভ্যন্তরীণ সংঘাতে বহুধা বিভক্ত। তবুও জাকির মুসার নেতৃত্বাধীন হিজবুল মুজাহিদিন

কাশ্মীর সমস্যাকে রাজনৈতিক ইস্যু না বলে, বলে থাকে কাশ্মীর হলো ইসলামি সংগ্রামের প্রতীক।

কাশ্মীর উপত্যকায় অত্যন্ত সক্রিয় পাকিস্তানি জেহাদি গোষ্ঠী হলো লস্কর-ই-তৈবা। এটির জন্ম হয়েছিল আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। মূলত মারকাজ দাওয়া-উল-ইরশাদ নামে একটি বৃহৎ মজহবি সংগঠনের জঙ্গি শাখা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল লস্কর-ই-তৈবা। এই গোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নৃশংস নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সেরা জঙ্গির তালিকাভুক্ত তিন নেতা—হাফিজ মুহম্মদ সাইদ, জাফর ইকবাল এবং আবদুল্লাহ আয়তাম। এদের মূল কার্যকলাপ কাশ্মীর উপত্যকায়। গোটা পাকিস্তান এবং কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে এই গোষ্ঠীর বৃহত্তম জঙ্গি নেটওয়ার্ক। এদের নিজস্ব অফিস আছে ২,২০০টি এবং বিশাল সংখ্যক জঙ্গি সমর্থক যারা নিজেদের যোদ্ধা বা Warrior হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। হাফিজ সাইদের একমাত্র লক্ষ্য কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বৈশ্বিক ইসলামি দেশগুলির অন্যতম হিসেবে পাকিস্তানকে মর্যাদা দেওয়া।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত যতগুলি বড়ো বড়ো জঙ্গিহানা ভারতের মাটিতে সম্পন্ন হয়েছে তার সিংহভাগেরই দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বাস—পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ‘ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স’ (ISI) এবং লস্কর-ই-তৈবার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাই শহরে আফজল কাসভনসহ একটি জঙ্গিবাহিনী যে নরসংহারের উদাহরণ রেখেছিল, তার পিছনেও ছিল লস্কর-ই-তৈবার সুতীক্ষ্ণ পরিকল্পনা। গোষ্ঠীটির আর্থিক সংগতিও যে কোনও বড়ো মাপের কর্পোরেট সেক্টরের মতই। কারণ বিদেশে বসবাসকারী মোটা অর্থ উপার্জনকারী পাকিস্তানি এবং কাশ্মীর উপত্যকার বেশ কিছু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীরা এই গোষ্ঠীর অর্থ সংগ্রহের মূল চাবিকাঠি।

মাওলানা মাসুদ আজহার—যার নাম এখন গোটা ভারতবাসী জানে। শুধু জানেই না, ভারতবাসী দাবি করে, এই শয়তানরূপী জঙ্গি নেতাকে বিশ্বের গণতন্ত্রের দরবারে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হোক। কারণ এই অমানুষটিকে ভারত সরকার গ্রেপ্তার করেও ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর তার মুক্তির দাবিতে ভারতবর্ষের মাটিতে অতি সক্রিয় হারকত-উল-মুজাহিদিন গোষ্ঠী। অন্যতম শাখা সংগঠন জইশ-ই-মুহম্মদের কয়েকজন জঙ্গি নেপাল থেকে দিল্লিগামী একটি ভারতীয় যাত্রীবাহী বিমানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় কান্দাহারে। একশো শতাংশ ব্ল্যাকমেলিং কৌশলে যাত্রীবোঝাই বিমানটিকে ধ্বংস করে দেবার ভয় দেখিয়ে ভারত সরকারকে বাধ্য করে মাসুদ আজহারকে মুক্তি দিতে। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর এই জইশ-ই-মুহম্মদ কাশ্মীর আইনসভায় আচম্বিতে হানা দিয়ে ৩১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ২০০৩ সালে এই জঙ্গি গোষ্ঠীই



পাকিস্তান প্রশাসনের সঙ্গে মতান্তরের কারণে তৎকালীন পাক-রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের উপর আত্মঘাতী হামলার ছক করেছিল। যদিও সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

হিন্দু-বিরোধিতার পাশাপাশি তীব্র খ্রিস্টমত বিরোধী জইশ-ই-মুহম্মদ ২০০১ সালে মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে হত্যা করেছিল। সেই মামলায় দলীয় নেতা ওমর সইদ শেখকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। প্রচুর আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে জইশ-ই-মুহম্মদ গোষ্ঠীর। সেই অর্থ জোগানের পিছনে ইন্টার স্টেট সার্ভিসেস এরও অবদান আছে। যদিও প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত জইশ গোষ্ঠী ক্রমাগত পাকিস্তান প্রশাসনের পক্ষেও ভয়াবহ হয়ে উঠায় ২০০২ সালে পাক-সরকার জইশ গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মাসুদ আজহার আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। জনচক্ষুর আড়ালে থেকেই সংগঠনের জন্ম দেন। প্রথম

সংগঠন খুদ্দাম-উল-ইসলাম (KUI) এর নেতৃত্বে থাকেন নিজেই। দ্বিতীয় সংগঠন জামাত-উল-ফুরবানের দায়িত্ব দেন আবদুল্লা জব্বারের ওপর। যদিও প্রশাসনিকভাবে দুটি গোষ্ঠীই এখনও

পাকিস্তানের হিংস্র নিঃশ্বাসে
দমবন্ধ কাশ্মীর আজ মুক্তির
নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই সমস্ত
পদক্ষেপই আসলে
পাকিস্তানকে বুঝিয়ে
দেওয়া—তোমার দেশে যতই
দাউদ ইব্রাহিম বা আইসিসের
ছদ্মবেশধারী জঙ্গিদের আশ্রয়
দাও না কেন, সবার শেষ
পরিণতি হবে আল কায়েদা
নেতা ওসামা বিন লাদেনের
মতোই। আর গোটা বিশ্ব থেকে
বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত হবে পাকিস্তান।

চাক—ভারত সরকার তাকে বাঁচতে দেবে না। এটাই তার ভবিষ্যৎ। পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মাটিতে এই সব বড়ো মাপের জঙ্গি সংগঠনগুলির পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু ছোটো ছোটো জঙ্গি

জইশ-ই-মুহম্মদ পরিচিতি হারিয়ে যেতে দেয়নি। কারণ জইশই পাক-সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা একটি ব্রান্ড। জইশকে ভারত সরকারও অত্যন্ত নজরে রাখে। কারণ হায়নার মতো সুচতুর এই মাসুদ আজহার যখন তখন যা খুশি করতে পারে। ফলত, ভারত সত্যিকার সুযোগ পেলেই মাসুদ আজহারকে বন্দি করবে এবং ১৯৯৯ সালের ব্ল্যাকমেলিং এর প্রতিশোধ নেবে। গত মে মাসে পহেলগাঁওতে ২৬ জন ভারতীয়কে পাক জঙ্গিরা হত্যা করার পর ভারত যখন পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ চালায়, তখনও স্পষ্ট ছিল পাকিস্তানের অন্দরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় আজহারের মোট সাত জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু হলেও আজহার সুরক্ষিত থেকে যায়। শোনা যায়, পারিবারিক সাত সদস্যের নৃশংস মৃত্যুর পর সে বেঁচে থাকতে চায়নি। তবে তার এটাও মনে রাখা উচিত, সে বাঁচতে চাক বা না

গোষ্ঠী যেমন—আল বদর, আল উমর, জামিয়ত-উল-মুজাহিদিন, এলইটি ইত্যাদি। কটরপন্থী এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং তা পাক ভূমির অন্তর্ভুক্ত করা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে যে দেওবন্দি গোষ্ঠীগুলি অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, সেই গোষ্ঠীগুলি পাক-দেশ তৈরি হবার পরও সম্ভ্রাসের পথ থেকে পিছু হটেনি। তবে সিপাহ-ই-সাহাবা বা লঙ্কর-ই-বাংভি মূল লক্ষ্য আগের মতই শিয়াদের বিরোধিতা করা। এরা দাবি করে, শিয়াদের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মতোই অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা হোক, যাতে তারা কোনোভাবেই বৈশ্বিক মুসলিম প্রবাহের সুযোগ সুবিধা নিতে না পারে। সিপাহ-ই-সাহাবার নেটওয়ার্ক গোটা মুসলিম দেশগুলি জুড়েই। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত প্রায় ৬০০০ কর্মী। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশেই রয়েছে এদের পাঁচশোটি অফিস। এছাড়া আন্তর্জাতিক অফিস রয়েছে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

একইভাবে পাকিস্তানকে শিয়াশূন্য করার লক্ষ্যে বদ্বপরিকর লঙ্কর-ই-বাংভি। মূলত পাকিস্তানের করাচি ও পঞ্জাবে অবস্থিত এই গোষ্ঠী প্রাক্তন পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এই গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দেয় করাচির ধনী মুসলমানরা।

কাশ্মীরের মাটি আঁকড়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণের এমনই আর একটি সহিংস জঙ্গী সংগঠন হলো হারকাত-উল-মুজাহিদিন। মূলত হারকাত-উল-জেহাদ-ই-ইসলামি থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা নেতা মওলানা ফজলুর রহমান খলিল এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা। মজহবি শিক্ষা সংগঠন মাদ্রাসার আড়ালে শুধু কাশ্মীরেই নয়, আফগানিস্তানেও জঙ্গি প্রশিক্ষণে খুবই সক্রিয়। দেওবন্দি মজহবি সংগঠন জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম ফজলুর রহমান উপদলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হরজত-উল-মুজাহিদিন আফগানিস্তানের খাইবার পাখতুনখোওয়া এবং মানসেরা ও পাকিস্তানের মুজফফরাবাদে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে।

দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত ও দরিদ্র মুসলমান পরিবারের সন্তানদের কখনও বেহেশ্ত কখনও টাকা-কড়ি, গাড়ির লোভ দেখিয়ে জঙ্গি হিসেবে গড়ে তোলে। তারপর ঠেলে দেয় ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলার মধ্যে।

আসলে কখনও কাফেরদের নিকেশ করা, কখন ইসলামি আমিরত প্রতিষ্ঠা করা, কখনওবা বৈশ্বিক ইসলামিক মৈত্রীর ধূয়ো তুলে এরা সৌদি আরব থেকে শুরু করে পাকিস্তানের, এমনকী ভারতবর্ষেরও ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি টাকার অনুদান সংগ্রহ করে। সেই টাকার একটা অংশ দিয়ে কেনা হয় আইইডি, মর্টার, রকেট, গ্রেনেড, বন্দুক এবং সেগুলি ব্যবহৃত হয় গণহত্যা, মৃত্যুদণ্ড, অপহরণ অভিযান,

বিধ্বংসী হামলার মত হিন্দু ও খ্রিস্টান বিরোধী সক্রিয়তায়। জঙ্গি সংগঠনগুলির এটা হলো একাংশের সক্রিয়তা। কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকে বেআইনি পথে কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রা উপার্জন এবং স্বনামে বা বেনামে দেশে বিদেশে নেতাদের নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের যাবতীয় আস্তানা গড়ে তোলা। মুজাহিদ জিহাদি কাউন্সিল এমনই একটি সংগঠন যেটির পিছনে রয়েছে পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদত। হিজবুল মুজাহিদিনের নেতা সৈয়দ সালাহউদ্দিনের কর্তৃত্বে পাক-সরকার ১৩টি শীর্ষস্থানীয় জেহাদি সংগঠনকে এই জোট সংগঠনটি তৈরি করে যাতে সরকার এই সংগঠনগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। বর্তমানে এই মুজাহিদ মুজাহিদিন বা ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৬। সেই সদস্যরা হলো লঙ্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম), হিজবুল মুজাহিদিন, হরকত-উল-আনসার, তেহারিক-ই-জিহাদ, তেহারিক-উল-মুজাহিদিন, আল জেহাদ, আল উমর মুজাহিদিন, জম্মু-কাশ্মীর ইসলামিক ফ্রন্ট, মুসলিম জানবাজ ফোর্স, হিজবুল্লাহ আল ফাতাহ, হিজাবুল মোমিনি, আল বদর মুজাহিদিন ও জামাত-উল মুজাহিদিন। মূলত পাকিস্তানের মাটি থেকে উদ্ভূত এই সমস্ত জঙ্গি সংগঠনগুলির সংযুক্তিকরণ নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপী জঙ্গি কার্যকলাপকে সক্রিয় করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং আধুনিক মিসাইল ও ড্রোন হামলার উপকরণও এই গোষ্ঠীগুলির কাছে এসে পৌঁছেছে পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে।

ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল বা ইউজেসি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে—“পাকিস্তান তাদের আদর্শ লক্ষ্য....মুক্তিযোদ্ধারা (কাশ্মীর) পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। জেহাদ আরও শক্তিশালী হচ্ছে..... মুজাহিদিনরা আরও সংগঠিত হচ্ছে এবং কৌশলগতভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে আক্রমণ করছে। এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন ইউজেসি কমান্ডার মঞ্জুর শাহ। সংগঠনটি আরও ঘোষণা করেছে—“ইউজেসি-র লক্ষ্য হলো সংগঠনের সব সদস্যের মধ্যে ঐক্য আনা, একটি সম্মিলিত সামরিক কৌশল পরিকল্পনা করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে একটি সাধারণ অবস্থান তৈরি করা।” সৈয়দ সালাহউদ্দিনের ঘোষিত এই বক্তব্যের মূল লক্ষ্য কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং তা পাকিস্তানের অধীনে নিয়ে যাওয়া। সালাহউদ্দিন মনে করেন ভারতের মুসলমানরাও এটা চান উপমহাদেশের স্বার্থেই। তাঁর বক্তব্য—“যদি ভারত কাশ্মীর সমস্যার বাস্তবতা মেনে নেয় তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ভারত যদি কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধে তার সেনাবাহিনীর ব্যবহার অব্যাহত রাখে তাহলে ইউজেসি-র হাতে বন্দুকের ব্যবহার ছাড়া বিকল্প কিছু থাকবে না। এ যেন সেই ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই মুসলিম লিগের কর্মপরিষদের সভায় মহম্মদ আলি জিন্নার ভাষণের পুনরুক্তি। আমি এখন আর নীতিকথা বলব না। আমাদের একটি

পিস্তল আছে। এখন সেই পিস্তলটি ব্যবহার করতে হবে।

২০১৭ সালের ২৬ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈয়দ সালাহ-উদ্দিনকে ‘বিশ্ব সম্ভ্রাসী’ বা ‘ওয়ার্ল্ড টেররিস্ট’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাতেও এদের উৎসাহকে দমানো যায়নি। কারণ এদের পিছনে রয়েছে বিশ্ব ইসলামিক সম্ভ্রাসী শক্তি—ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ট যা কখনও আইএস আবার কখনও আইএসআইএস নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীটিকেও জাতিসংঘ সম্ভ্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আইসিসের উত্থান ঘটেছিল ১৯৯১ সালে জামাত-আল-তাউহিদ ওয়াল-জেহাদ নামের ব্যানারে। এই সংগঠনটি ছিল আল কায়েদার প্রত্যক্ষ সমর্থক। বর্তমানে এই আইসিস পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-সহ মোট ১৮টি দেশে সক্রিয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে আইসিস আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে ঘিরে ‘ইসলামিক স্টেট অব খোরাসান’ বলে ঘোষণা করে। পাক সরকার আইসিসের কর্তৃত্ব মেনেই

চলতে বাধ্য কারণ, পাকিস্তানে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ২০০টির বেশি সংগঠন রয়েছে যাদের আদর্শ আইসিসের কার্যাবলীর সঙ্গে মিলে যায়। ফলত গোটা বিশ্বের মুসলমান সমাজের মধ্যে আইসিস প্রভাব ছড়িয়ে ফেলতে পারে অতি দ্রুত। ফলত ভারতবর্ষের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম প্রধান দেশগুলি যে নিরাপদ প্রতিবেশী এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। কারণ আইসিস, আইএস, আইএসআই অথবা বিশ্বসম্ভ্রাসী মুসলিম সংগঠনগুলির নেতৃত্বের মস্তিষ্ক এতটাই বিযুক্ত যে তারা হিংসা, হামলা, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, রক্তপাত, আগুন, ছাড়া কোনো ইতিবাচক ভাবনাই ভাবতে পারে না। এই জায়গা থেকেই প্রশ্ন উঠে আসে—পাকিস্তানের মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষ কি তাদের ডিএনএ-র অংশীভূত? গাদা গাদা জঙ্গি সংগঠনকে পুষে রেখে তাদের মদত দিয়ে ভারতকে বার বার উত্ত্যক্ত করায় পাক সরকারেরই-বা কী লাভ হয়?



অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি প্রতি
আক্রমণই নয়—ভারতীয় নারী,
ভারতীয় দাম্পত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির
সপক্ষে প্রশাসনিক স্তরে একটি
যথাযোগ্য জবাব—হে পাকিস্তান, তুমি
ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছেছো
পরিকল্পিত হত্যার মাধ্যমে। তার
পরিবর্তে আমরা ভারতীয়রা
তোমাদের সামরিক ঘাঁটি আর জঙ্গি
ঘাঁটিগুলির মূল চালিকাশক্তির
কেন্দ্রভূমিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিলাম।

পাকিস্তান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। একদিকে সাম্প্রদায়িক, অন্যদিকে সম্ভ্রাসবাদ—এছাড়া তৃতীয় কোনো ভাবনা ছাড়াই একটা স্বাধীন দেশ যে সুঠাম কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—এই বোধটাই পাকিস্তানি প্রশাসক তথা নাগরিকদের মস্তিষ্কে কোনো শক দিতে পারে না। পাকিস্তান ভূট্টোর মতোই আজও বিশ্বাস করে—কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ না থাকলেও ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন মনোভাবই পাকিস্তানকে দীর্ঘজীবন দিতে পারবে।

অতএব প্রশ্ন ওঠে এর ফলে পাকিস্তানের লাভ কোথায় এবং কতটুকু? মুসলিম হোমল্যান্ডের দাবি প্রথম করেছিলেন ‘দেওবন্দি’ সাম্প্রদায়িক মোল্লাবাদীরা যার পরবর্তীকালে নানা জঙ্গি সংগঠনকে সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়। কিন্তু এখানেই ঘৃণার রাজনীতির শেষ হয়নি। ‘পাকিস্তান’ (পাক-ই-স্তান) বা ইসলামের পবিত্র ভূমির প্রথম দাবিদার ছিলেন

পাকিস্তান কেন ভারত বিরোধী?

নিজের দেশের গন্দারদের হাতে ফাঁসির দড়িতে বুকে পড়ার আগে পাকিস্তানের তীব্র ভারত বিরোধী রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলি ভুট্টো একবার বলেছিলেন— ‘Pakistani nationalism is thus a continuous contest with India or a thousand year war.’ অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানি ব্রাদারহুডের লড়াই একটি ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা, এই যুদ্ধ চলবে আগামী হাজার বছর ধরে।

বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতা যে দেওবন্দি নেতৃত্বের হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল—১৯৪৭ এ পাকিস্তান জন্মের পরও আজ তা অক্টোপাশের মতো শত সহস্র হস্তে বিস্তারিত। এটা বিস্ময়কর যে, গোটা বিশ্ব যখন শিক্ষা, কর্মকুশলতা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, কারিগরি উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তীব্র ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তখন

তৎকালীন কেন্সিঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ছাত্র—মহম্মদ আসলাম খান খটুক, চৌধুরী রহমত আলি, শেখ মহম্মদ সাদিক এবং ইনায়েতউল্লা খান। এই দাবির নেতৃত্ব দিলেন চৌধুরী রহমত আলি। ১৯৩৩ সালের ২৮ জানুয়ারি এই চার ছাত্র ইংরেজি ভাষায় একটি দীর্ঘ প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল—Now or Never : Are we to live or perish for ever? সেই প্রচারপত্রে এই চার ছাত্রের মূল দাবি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ৩০ মিলিয়ন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের প্রয়োজন। তার কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব মজহব, সংস্কৃতি, লোকাচার, চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল— ‘If we, the Muslims of Pakistan, with our distinct marks of nationality, are deluded into the proposed Indian Federation by friends or foes, we are reduced to a minority of one to ten. This reduction sounds the death-knell of our nation in Pakistan. To help you to realise the full magnitude of this impending catastrophe, let us remind you that we thirty millions constitute about one tenth of the whole Muslim world. The total area of our five units (in Northern Provinces in India) is four times that of Italy, three times that of Germany and twice that of France, and their population seven times that of Commonwealth of Australia, four times that of the Dominion of Canada, twice that of Spain, and equal to France and Italy considered individually.’ প্রচারপত্রে আরও স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছিল— ‘It is on this basis of such facts and realities that we assert without fear of contradiction that we, the Muslims of PAKISTAN, do possess a separate and distinct nationality from that of the Hindus in India, who constitute the Hindu nation and live and have every right to live in most of India, and that we deserve and demand the recognition of our national status by the grant to Pakistan of a Federal constitution, separate from the rest of India.’ কেন্সিঞ্জের এই চার ছাত্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—পঞ্জাব, আফগান প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধ, বালুচিস্তানকে আলাদা দেশের অধীনে আনা, কারণ তারা ভয় পাচ্ছিল—হিন্দু প্রভাবিত ভারতবর্ষে মুসলমানরা তাদের সব ধরনের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

না, এই প্রচারপত্রে কোনো হিংসার কথা সরাসরি ছিল না—কিন্তু বৈষম্যের কথা ছিল। তাঁরা অস্তিত্ব রক্ষার সংকট থেকে অব্যাহতি চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল— হিন্দুরা থাকুক ভারতবর্ষে তাদের মতো করে—মুসলমানরা থাকুক পৃথক দেশে তাদের অধিকার নিয়ে। প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল এর ফলে হিন্দু—মুসলমান কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাবে না। কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তাঁরা লিখেছিলেন— ‘We are convinced that there can be no peace and progress in India, if we, the Muslims, are duped into a Hindu dominated federation in which we cannot be the masters of our own destiny and

captains of our own souls.’

প্রাথমিকভাবে এই ভাবনা নেতিবাচক হলেও, বিধ্বংসী ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ভাবনাই ভারতবর্ষের মুসলিম লিগ নেতাদের হিন্দু বিদ্বেষ এবং একশো শতাংশ হিন্দু বিরোধিতার পথে টেনে নিয়ে গেল। ততদিনে অবিভক্ত বঙ্গে অনেকগুলি দাঙ্গা ঘটে গেছে। পাকিস্তানের দাবি জোরদার হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক শত্রুতার সম্পর্কে নেমে এল স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগের মুহূর্তে কলকাতার বুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে মুসলিম নেতৃত্ব যে হিন্দু হত্যার রক্তাক্ত খেলা খেললো ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট থেকে পরবর্তী পক্ষকাল, তাতে পরিস্ফুট হলো—ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তির বাতাবরণ মুসলমানরা রাখবে না। সম্ভবত রহমত আলি চৌধুরীও সেটি বুঝেছিলেন। তাই ১৯৪৬-এর হিন্দু নরসংহার তিনি মেনে নিতে পারেননি। পারেননি বলেই বোধ হয় তাঁরই ভাবনার পরিণতি ‘পাকিস্তান’-এ তিনি কখনও পা রাখেননি। জিন্নাও কখনও চৌধুরী রহমত আলির নাম উচ্চারণ করেননি। সেও এক রহস্য। তবে আসলাম খান খটুক ফিরেছিলেন এবং দীর্ঘদিন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্যপাল, বিদেশে রাষ্ট্রদূত এবং পাক সরকারের মন্ত্রীপদও অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে পাক সরকার তাঁকে সিতারা-ই-পাকিস্তান পুরস্কারে সম্মানিত করে।

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় জঙ্গিবাদের অনুপ্রবেশ কিন্তু সেই অর্থে বিভাজিত দুই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনেক পরে। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলেই কাশ্মীর সমস্যার সূত্রপাত। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা হলো— হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তখনই বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক হয়ে উঠলেও এখনকার মতো ভয়াবহ দুর্বৃত্তের সংজ্ঞা তখনও পাকিস্তানি ও কাশ্মীর মুসলমানরা পায়নি। সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ সবই হয়েছে কিন্তু কোথাও একটা বাঁধন, ছিল যাতে কাশ্মীরের পর্যটকদের কখনও সরাসরি ‘হিন্দু’ বলে গুলি খেয়ে মরতে হয়নি। হিন্দু জননেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হত্যার পিছনে কাশ্মীরের সংখ্যালঘু রাজনীতি অবশ্যই ছিল কিন্তু ওই হত্যার পরে চরম চাপের মধ্যেও পরে গিয়েছিল কাশ্মীরের মুসলমান প্রধান সরকার।

ভারতের মাটিতে কাশ্মীরের আজাদি আন্দোলন এবং পাকিস্তানের সরকারি মদতে গায়েগতরে বেড়ে ওঠা দুর্বৃত্ত সংগঠনগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে আসার পর। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে যে চরম বিরোধিতার প্রকাশ্য চেহারা সামনাসামনি প্রকাশিত হয়েছিল, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তার কারণ, পাকিস্তান সরকার এবং জঙ্গিরা ভয় পেতে শুরু করে, মুসলিম বিরোধিতা যত তীব্র হবে, ভারত সরকার এবং ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবোধ ততই প্রবল চেহারা নেবে। গুলি ছুঁড়লে ভারত গুলিই ছুঁড়বে—রসগোল্লা

নয়। লক্ষণীয়, যতবার ভারত-পাকিস্তান সমঝোতা আলোচনা বা চুক্তি প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে ততবারই সমস্ত নিয়মকানুন শিকেয় তুলে পাক সরকারের মদতে ভারতবর্ষে জঙ্গিহানা হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ পাকিস্তান ভ্রমণে গেলে, জইশ-ই-মহম্মদ এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠানকোট এয়ারবেসে আক্রমণ হানে। ২০০৮ সালে ২৬/১১য় মুম্বাইতে পাক জঙ্গিরা গণহত্যা চালায় যখন, তখনও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিল্লিতে উপস্থিত। লাহোর চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের কাগিল হানা চুক্তিভঙ্গেরই পরিণাম। এগুলোই প্রমাণ করে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে চায় যাতে ভারত সরকার দেশের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ না করে যুদ্ধেই ব্যস্ত থাকে।

পাকিস্তানের এই স্থায়ী শত্রুতা যদি হয় ভারত-পাক সম্পর্কের তিক্ততার প্রথম কারণ তাহলে দ্বিতীয় কারণ হলো পাকিস্তানের সেনা-নির্ভর প্রশাসন। একটা কথা খুব প্রচলিত—Pakistan is an army with a state. অর্থাৎ একটা দেশের প্রশাসন কোমরভাঙা একটা কাঠামো মাত্র। সেখানে সেনার কথাই শেষ কথা। তাই বোধহয় পাকিস্তানি লেখক হুসেন হাক্কানি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—“Pakistan inherited one-third of British India’s army but only 17% of its own resources. That propelled the army into the drivers seat in defining Pakistani nationalism.” (Ref. Why the Pakistan’s deep state sponsors terrorism in India by Shivam Vij, The Print dt. 18 Feb. 2019) ফলত, পাক সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর ওপর খাটে না। আর সেনাবাহিনীই জঙ্গি সংগঠনগুলিকে গড়ে তোলে, সম্ভ্রাসী অস্ত্রসাজে প্রশিক্ষণ দেয় এবং ভারতের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। পাক সরকার বসে থাকে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে। পাকিস্তানি স্কলার আয়েশা সিদ্দিকা তার Military Inc. বইতে অভিযোগ করেছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বোধহয় বিশ্বের একমাত্র সেনাবাহিনী যারা দোকানদারি করে—যারা সিমেন্ট বেচে, মাংসও বেচে। যারা জামাকাপড় বেচে আর বিমাপত্র বেচে। তাহলে যুদ্ধ করে কারা? জঙ্গিরা গোপনে, ছদ্মবেশে, দেশে বিদেশে ইঁদুর ছানার মতো গুপ্তচর বাহিনীকে খুঁদকুঁড়োর মতো ঢাকা পয়সা ছড়িয়ে পুষে রেখে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ৩৩টা বছর পাকিস্তানের সরকার চালিয়েছে সেদেশের সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতি পদে বসে। বাকি সময়টা তারা পুতুলের মতো বসিয়ে রেখেছে সিভিলিয়ান সরকারকে।

এই সেনা কেন এত ভারত বিদ্বেষী?

আসা যাক তৃতীয় যুক্তিতে। সোজা কথা ভারত-বিদ্বেষ মূলত প্রতিশোধ নিতে। কারণ ১৯৭১ বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনার প্যান্ট খুলে নিয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিতেই পাক সামরিক বাহিনীর এত ভারত-বিদ্বেষ। তখন সামরিক প্রধান নিয়াজির সব পিয়াজি খতম করে দিয়েছিল মাত্র

কয়েকদিনের যুদ্ধে। ভারত ইচ্ছে করলে সেদিন পাকিস্তানও দখল করে নিতে পারত। কিন্তু ভারত তা করেনি। সেই পদক্ষেপটা ছিল পাকিস্তানের মুখে রীতিমতো জোরলো চপেটাঘাত। সেই লজ্জা, সেই দুঃখ ভুলতে পাক সামরিক বাহিনী নিজেদের সংশোধন ও উন্নত করার বদলে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে শক্তপোক্ত করে তুলেছে। ভারতবর্ষে এত পাক-জঙ্গি হানার মূল কারণ এটাই। দিল্লি নিবাসী এক পাকিস্তানি স্কলার হ্যাপিমন জেকব সে কথাই বলেছেন—‘Whether or not we would like to acknowledge it, the humiliation of 1971 has had a defining impact on the psyche of the Pakistani military and its approach towards India ever since. It would be a historical to not view its current policy towards India and Kashmir as not being influenced by that deeply entrenched feeling of humiliation’.

পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষের চতুর্থ কারণটা আরও হাস্যকর। যে ক্রিকেটার ইমরান খানকে ভারতের মানুষ চিরকাল আন্তর্জাতিক মানের সম্মান জানিয়ে এসেছে, সেই ইমরান খানও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সখেদ উক্তি করেছিলেন—‘ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রতি যে তিক্ত আচরণ করা হয়, সেটাই প্রমাণ করে ১৯৪৭ সালে কেন ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান দেশের জন্ম হয়েছিল।’ ইমরান খানের এই অযৌক্তিক ভাব্যের অর্থ দাঁড়ায় একটাই—ঘৃণা নয়, নিজেদের ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলছে পাকিস্তান আর উগরে দিচ্ছে সমস্ত উত্তাপ ভারতের দিকে, কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কিংবা প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও দক্ষতা গড়ে তোলায় পাকিস্তান গত ৭৮ বছরে ভারতীয় সূচকের ধারে-কাছেও আসতে পারেনি। পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যা সমাধানে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় তাই তারা ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় জঙ্গি হানার উদাহরণ সামনে রেখে যাতে পাকিস্তানের যে সিংহভাগ অশিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত জনসংখ্যা আছে তারা ছাগলের তৃতীয় ছানার মতো উল্লাসে মত্ত হয়ে ভুলে যায়, আগামীদিনে তার পাতে ‘চাউল ওর রোটি-সবজি’ জুটবে না। পাকিস্তানের ভরসা গত ৭৮ বছর ধরে এই পররাষ্ট্র নীতিই এবং এটাই তারা চালিয়ে যাবে। বার বার সার্জিকাল হানায় বিধ্বস্ত হবে। বার বার বিশ্বের দরবারে সাদা পতাকা হাতে হাজির হবে—ভারতের সঙ্গে সমঝোতা চাই বলে। দুদিন পরে আবার মাসুদ আজহারের মতো সারীসূপ জঙ্গিনেতার নেতৃত্বে নিরপরাধ ভারতীয়দের আচম্বিতে হানায় হত্যা করে গর্তে লুকোবে। এটাই পাকিস্তানের ন্যাশানাল ক্রাইসিসকে ধামাচাপা দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি।

পাকিস্তানের সম্ভ্রাসী হামলা এখন গোটা বিশ্বের চোখে নিম্ননীয়। এমনকী ভারতের ওপর পাকিস্তানের বারবার সম্ভ্রাস হামলা এবং শয়ে শয়ে ভারতীয় হত্যার নিদর্শন আজ ইরান ও আফগানিস্তানের বালুচ জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে

বাধ্য হয়েছে। বালুচরা তো রীতিমতো স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে বালুচিস্তানের মাটিতে। পাকিস্তান নিজেই এখন নিজের অধিকৃত আফগানভূমিতে তীব্র পরাজয়ের মুখে। পাক-প্রশাসনের চরমতম হিংসা প্রীতি এবং সম্ভ্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা সম্ভ্রাসী দেশের তকমা আদায় আজ প্রশাসনের কাছে গর্বের বিষয়—এতটাই মূর্খ একটা দেশ। আর এই নীতিই আগামীদিনে পাকিস্তানকে একঘরে করে দেবে যতই কেন তারা আন্তর্জাতিক স্তরের জঙ্গিবাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করুক।

কাশ্মীর এতকাল ছিল পাক জনগণের সামনে লোভনীয় ললিপপ। পাক প্রশাসন স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্নকে ললিপপের মতো ব্যবহার করে ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার স্ট্রাটেজিটা ছিল জিন্নার একটা আত্ম-অহমিকার প্রকাশ। তাই প্রতিটি কাশ্মীরি মুসলমানকে বোঝানো হয়েছিল, কাশ্মীর পাকিস্তানের, ভারত জের করে আটকে রেখেছে। হিংসা দিয়ে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে হবে। ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯—তিনবারের যুদ্ধেই কাশ্মীর দখলের চেষ্টা থেকে পাকিস্তান নিবৃত্ত ছিল না। কিন্তু তিনবারই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরতে হয়েছে পাকিস্তানকে। তাদের গর্ব একমাত্র পাক অকুপায়েড কাশ্মীর (POK) এর দখলীকৃত ৫১৩৪ বর্গমাইল এলাকা।

দীর্ঘকাল ধরে ভারত সরকারের দেওয়া অন্যায় স্ট্যাটাস (৩৭০ ধারা) উপভোগ করা। নরেন্দ্র মোদীর তুখোড় পদক্ষেপে সেই বিশেষ অধিকার বাতিল হয়ে গেছে। জঙ্গিবাদ সিংহভাগই স্তিমিত। রাজ্যের মুসলমান প্রশাসনেরও হস্তিত্ব বন্ধ হয়ে গেছে। এবার মোদী সরকার প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে যে পরবর্তী লক্ষ্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের অংশকে পুনরুদ্ধার করা। তবে কবে হবে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ তা অনেকটাই নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর।

এই মুহূর্তে একটা সত্য উপলব্ধি বিশ্বের দরবারে ভারত পাকিস্তানের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি কাশ্মীরের পহলগাঁওয়ে পাক জঙ্গিরা যেভাবে ২৬ ভারতীয় নাগরিককে, বিশেষ করে হিন্দুদের চিহ্নিত করে হত্যা করেছে—তার জবাব দিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিশেষ করে ভারতীয় বিমানবাহিনী অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে। অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি প্রতি আক্রমণই নয়—ভারতীয় নারী, ভারতীয় দাম্পত্য, ভারতীয়

সংস্কৃতির সপক্ষে প্রশাসনিক স্তরে একটি যথাযোগ্য জবাব—হে পাকিস্তান, তুমি ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছেছো পরিকল্পিত হত্যার মাধ্যমে। তার পরিবর্তে আমরা ভারতীয়রা তোমাদের সামরিক ঘাঁটি আর জঙ্গি ঘাঁটিগুলির মূল চালিকাশক্তির কেন্দ্রভূমিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিলাম। এবার যদি আবার ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতনী ঐতিহ্যের শিকড়ে আঘাত হানো—জেনে রেখো ভারতের লক্ষ্য হবে তোমাদের সীমিত পরমাণু অস্ত্রের ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া। বিশ্বের কোন শক্তি তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না।

পাকিস্তানে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। কারণ এখন পাকিস্তানের ঘরে-বাইরে প্রতিবাদের ঝড় বইছে শন শন করে। পাকিস্তানের জনগণ বুদ্ধ বিশ্বসচেতন বুদ্ধিজীবী আহমেদ রশিদ, আরিশউল্লা খান, হাসান আব্বা, জাহিদ হুসেন, হুসেন হাক্কানি, হ্যাপিমন জেবাব প্রভৃতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরিফ, এমনকী পারভেজ মোসারফও প্রাক্তন সামরিক প্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া সহ বহু মানুষই প্রকাশ্যে পাক জঙ্গিবাদের তীব্র বিরোধিতার সুরে বক্তব্য রেখেছেন বিশ্বের দরবারে। আন্তর্জাতিক স্তরে ইরান এবং সৌদি আরবও পাকিস্তানের জঙ্গি নীতির সমর্থক নয়।

এই অবস্থায় ভারত সরকার এক-এক করে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য বিশেষ শরিয়ত আইন, মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের কুশ্রী প্রথা তালুক প্রথা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বাতিল করে বিশ্বের দরবারে মুসলমান সমাজের সামনে ভারতের মানবিক নীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। পাকিস্তানের হিংস্র নিঃশ্বাসে দমবন্ধ কাশ্মীর আজ মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই সমস্ত পদক্ষেপই আসলে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া—তোমার দেশে যতই দাউদ ইব্রাহিম বা আইসিসের ছদ্মবেশধারী জঙ্গিদের আশ্রয় দাও না কেন, সবার শেষ পরিণতি হবে আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মতোই। আর গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত হবে পাকিস্তান। এটাই ভবিতব্য। যত পুষবে জঙ্গি-বিশ্ব ততই হবে রণ-রঙ্গী। একদিন আসবে যেদিন বিশ্বের মানচিত্র থেকে আচমকাই মুছে যাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব। তিল তিল করে দেশটাকে টুকরো করার প্রাথমিক পরীক্ষা সফল হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এবার হাতছাড়া হতে চলেছে বালুচিস্তান। ভাঙতে ভাঙতে একদিন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে ইসলামের এই অপবিত্র ভূমি—পাক-ই-স্তান। কারণ, ঈশ্বর শুধুমাত্র পবিত্রতাকেই রক্ষা করেন। নিকেশ করেন অপবিত্রতাকে।



সেই কার্ঠের বাড়িটা

প্রবাল

স্বস্তিকা - পূজা সংখ্যা ১১ ১৪৩২ ১৬৯

যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ছিল দুপুর। সুন্দর রোদ বলমলে দিন ছিল সেটা। এখন গোটা আকাশ ছেয়ে আছে মন-খারাপ-করা ঘোলাটে আঁধার মেঘে। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব তটরেখা জুড়ে ভিক্টোরিয়া রাজ্য। আর সেখান থেকে উত্তরে নিউ সাউথ ওয়েলস। যেখানে এসেছি, সেটা এই দুই রাজ্যের সীমান্ত। একদিকে অলবারি হলো নিউ সাউথ ওয়েলসের শহর, অন্যদিকে ওডোঙ্গা ভিক্টোরিয়া রাজ্যের শহর। মোটেল-মালিকের কাছে জানলাম, ‘ওডোঙ্গা’ মানে হলো সাইপ্রাস বা ঝাড়জাতীয় গাছ। স্থানীয় উরন্দজেরি উপজাতির লোকেরা এই নাম দিয়েছিল জায়গাটার।

এখানে এসেছি অফিসের কাজে। শহর থেকে একটু দূরে চাষের জমি আর ছাড়া-ছাড়া জঙ্গলের প্রান্তে এই মোটেলটা, একটা চত্বরের মধ্যে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কটেজ। আমার বরাদ্দ কটেজের চাবি খুলে মন খুশি হয়ে গেল। পাথরের দেওয়াল, পুরনো আমলের ফার্নিচার, দেওয়ালে অয়েল পেইন্টিং। উঁচু সিলিং। এক চিলতে বসার ঘর, বড়ো বাথরুম। শোবার ঘরটাও বেশ বড়। রান্নার জন্য ছোট্ট একটা জায়গা রয়েছে সেই ঘরের একপাশে, চা কফি বানানো যায়। দেওয়াল জোড়া কাচের দরজা, ওপারে বারান্দা। পরে বেরিয়ে দেখতে হবে বারান্দাটা কেমন, এখন একটু ঘুমিয়ে নিই। এক নাগাড়ে চার ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে শরীর মন দুটোই ক্লান্ত। ঝাঁপালাম বিছানায়, ঘুমের অথই সাগরে ডুবে যেতে যেতে মনে হলো—এই রে, রাতের খাবার কোথায় সারব? কিন্তু আমি তখন তলিয়ে যাচ্ছি, ভাবনাগুলো মাথায় এলেও শরীর পান্ডা দিল না। ঘুম ভাঙ্গল যখন, শরীর অনেকটা ঝরঝরে লাগছে, কিন্তু জম্পেশ খিদে পেয়েছে। রাত আটটা। ছোটো শহর, এদিকটা একটু নিরালাও। দূরে হাইওয়েতে গাড়ির সাঁই-সাঁই ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। নাহ্, আরেকটা শব্দ রয়েছে। দূরে কোথা থেকে যেন, একটা গভীর সুর ভেসে আসছে। বাইরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টের সন্ধান করতে হবে। ঘরের আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখলাম, বারান্দার স্লাইডিং দরজার কাঁচের ওপর একটা হাতের ছাপ। হাতের রেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে ছাপে।

সুটকেস খুলে গরম জামা বার করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল বেশ কয়েকটা বই। উনিশ সালে কলকাতায় গিয়েছিলাম, কলেজ স্ট্রিট থেকে এই বইগুলো কিনেছিলাম। পাক্সা পাঁচ বছর বইয়ের তাকে সাজানো ছিল, পড়া হয়নি। ভালোই হয়েছে ওগুলো সঙ্গে এনেছি, এখানে নিরিবিলিতে পড়া যাবে, সময় কাটবে। গরম জামাকাপড় পরে মোটেল থেকে বেরোলাম। আশা, যদি একটা রেস্টুরেন্ট খোলা পাই। ছায়া ছায়া অন্ধকার, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে। রাস্তার মোড় ঘুরতে দেখি, ফুটপাথে বসে জনজাতি একজন একমনে ডিজরিডু বাজাচ্ছে।

এই ডিজরিডু খুব অদ্ভুত একটা বাদ্যযন্ত্র। মরা গাছের শুকনো গুঁড়ি দিয়ে বানানো পেঁয়াজ লম্বা নলের মতো, গায়ে নানান ছবি আঁকা। তাতে ফুঁ দিয়ে এখানকার জনজাতির মানুষ অদ্ভুত সব সুর বের করে। ওরা বলে, প্রতিটা ডিজরিডু নাকি আত্মসচেতন, সজীব এক সত্তা। অস্ট্রেলিয়ার জনজাতিরা দেখতে অনেকটাই ভারতীয়দের মতো। এই লোকটা—বড্ড চেনা লাগলো এর মুখ। কোথায় যেন দেখেছি। আমার চেনা কারোর সঙ্গে মিল আছে কি? এদের দর্শন, জীবনবোধ, পরিবেশ-সচেতনতা খুব উন্নত স্তরের, কিন্তু বড়ো দুঃখী এই মানুষগুলো। গর্বে অন্ধ সেকালের পাশ্চাত্য সভ্যতা, গোটা পৃথিবীতে সাদা মানুষ এদের বোঝা ভাবত। উন্নত প্রযুক্তির জোরে এদের সর্বশ্ব হরণ করেছিল। এমনকী এদের বাচ্চাদের পর্যন্ত মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে তুলে দিত, যাতে বাচ্চারা তাদের সভ্যতা, তাদের পরম্পরার কথা ভুলে যায়। সাম্রাজ্যবাদের সে হীন প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। সেইসব বাচ্চারা, যাদের এখানে ‘স্টোলেন জেনারেশন’ বলে, বড়ো হয়ে তারা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে তাদের অতীত, পরম্পরা, তাদের পূর্বজদের গল্পগুলো। আজ তাদের অনেকেই নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছে উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারে। কিন্তু এ এক অসম যুদ্ধ। প্রাচীন এক সভ্যতার সামুহিক স্মৃতি যদি মুছে গিয়ে থাকে, তবে সেই লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধার করার কি কোনো পথ আদৌ আছে? এখানকার জনজাতিদের বহুলাংশের মধ্যে জীবনের প্রতি বিরূপতা, নেশাভাঙ করে ভুলে থাকার চেষ্টা দেখা যায়। আমার মনে হয়, এসব ওই লুপ্ত স্মৃতিরই ফল। কোনো জাতি যদি ভুলে যায় পৃথিবীতে তার ভূমিকা কী, সেই মানসিক শূন্যতা জাতির বিবেককে প্রতিনিয়ত দন্ধে মারে।

রাস্তার ধার ধরে হাঁটতে লাগলাম। লম্বা লম্বা গাছ, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ধূ-ধু মাঠ। তার পেছনে জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে, বরফের মতো ঠাণ্ডা জোলো সে বাতাস। পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশার একটা পাতলা চাদর নেমে আসছে দূরে প্রান্তরের শরীরে। তার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা আলো দেখা যাচ্ছে। গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি। অন্ধকার বাড়িটা, ওপরে চিলোকোঠায় আলো জ্বলছে। বাড়ি থেকে দূরে থাকলে মনটা খারাপ লাগে। সেই মন খারাপ বেড়ে যায়, যখন দেখি রাতে অন্ধকারে অন্য বাড়িতে আলো জ্বলছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা সরাইখানা দেখতে পেলাম। ভাগ্য ভালো, খোলা ছিল। জানালার ধারে টেবিল পেলাম। ফায়ারপ্লেস জ্বলছে, বাতাসে পোড়া কাঠের মিষ্টি গন্ধ। আধো আলো আধো ছায়ায় সরাইখানার ভেতরটা কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে। ছোটোবেলায় পড়া আবোল তাবোল মনে পড়ে গেল—‘মেঘ মূলুকে ঝাপ্সা রাতে, রামধনুকের আবছায়াতে...।’ হাতে চিমটি

কেটে দেখলাম, সত্যিই কি এখানে আছি নাকি মোটেলের বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছি? একটু পরেই এল কাঠকয়লার উনুনে বলসানো মাছ, গোলমরিচ ছড়ানো আলুসেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ। খেতে খেতে জানালা দিয়ে দূরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই বাড়িটা এখানে থেকেও দেখা যাচ্ছে। ঝিরিঝিরি কুয়াশা বুলছে জঙ্গলের মগডাল থেকে, যেন হ্যাংলা হাতি চ্যাংদোলা।

মোটেল চত্বরে ঢুকে খেয়াল করলাম, অন্ধকারে জায়গাটা আরও সুন্দর লাগছে। অন্ধকার রাস্তার ধার ধরে জায়গায় জায়গায় রঙিন সোলার লাইট, নরম আলোর লুকোচুরি চলছে আশেপাশের ঝোপঝাড়। দরজা খুলে দেখি, উঁচু ক্যাথিড্রাল সিলিং থেকে লম্বা শিকলে আলো বুলছে। বাতাসে অল্প অল্প দুলছে শিকলটা, আলোটাও দুলছে। সঙ্গে দুলছে সব ছায়া। বড়ো হচ্ছে, ছোটো হচ্ছে। ছায়াগুলো যেন একসারি যন্ত্র, হঠাৎ করেই চালু হয়ে গেছে, কিলবিল করে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘর জুড়ে।

গরম কোকোর কাপে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, রান্নার জায়গার পাশেই আরেকটা দরজা আছে। ওদিকে কি আরেকটা ঘর আছে? দরজার হাতল ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম, দরজা খুলল না। যাকগে! আলো নিভিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

স্বপ্ন দেখছিলাম। জমাট বাঁধা একটা অন্ধকার ভেসে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। গুনগুন শব্দ করে কাঁপছে। কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে, আমার বিছানার ঠিক পাশেই।

—কে তুমি?

—আমি তোমাকে পথ দেখাচ্ছি।

—কীসের পথ?

—স্বপ্নের।

—স্বপ্নের আবার পথ হয় নাকি?

—হয়। আমার সুর তোমাকে পথ দেখাচ্ছে। মন দিয়ে শোনো আমার সুর।

দম বন্ধ করা অস্বস্তির বোধ নিয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘরের মধ্যে শিউলি ফুলের তীব্র সুগন্ধ, নাক জ্বালা করছে। এখন বোধহয় মাঝরাত। অস্বস্তিটা কীরকম, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। যখন জঙ্গলে বেড়াতে যাই, জঙ্গলে ঢুকতেই ইন্দ্রিয়গুলো অনাবশ্যক রকমের সতর্ক হয়ে পড়ে, কেন জানি না। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে তো কোনো বড়ো মাংসাশী প্রাণী নেই। বোধহয় এই সতর্কতার ব্যাপারটা আমাদের রক্তে আছে, পূর্বজ কোনো আদিম মানব জেনেটিক কোডের মাধ্যমে আমাদের বলে পাঠিয়েছে, জঙ্গলে অসাবধান হয়ো না। আজ ঠিক সেরকমই একটা অনুভূতি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে? এদেশের জনজাতিরা জীবনের স্তম্ভ হিসেবে সাতটা জিনিসে বিশ্বাস করে। পাঁচটি অনুভূতি—দেখা, শোনা, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, এটা তো আমরা সবাই মানি। ওদের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে যুক্ত হয় আরও দুটো জিনিস, যাদেরকে ওরা জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে মানে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর আবেগ। আধো ঘুম, আধো জাগার মধ্যে অনুভব করলাম, কানে ভেসে আসছে জঙ্গলের ছোটোখাটো নানান আওয়াজ, তার সঙ্গে একটা হাড় কাঁপানো বাতাস, সে বাতাসে ভেজা পাতার গন্ধ। বাইরের বাতাস ভেতরে আসছে কী করে? ভুল করে কোনো জানলা খুলে রেখেছি নাকি? অন্ধকারে আলোর সুইচটা খুঁজে পেলাম না। চোখ এবার সয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যেটা একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। রান্নার জায়গার দিকটা থেকে একটা আবছায়া আলো ভেসে আসছে না? হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, তখন যে বন্ধ দরজাটা টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করছিলাম, সেটা হাট করে খোলা। আমি যে টানাটানি করছিলাম, তাতেই কি ওটা খুলে গেছিল, আমি আগে নজর করিনি? দরজাটা বন্ধ করে দিই, এই ভেবে দরজার হাতলে হাত রাখলাম। বরফঠাণ্ডা হাতল ছাঁক দিল হাতে। বাইরে ঘন জঙ্গল। ডিজরিডুর ক্ষীণ আওয়াজটা এখনো ভেসে আসছে। নিবুম রাতে ডিজরিডুর গভীর আওয়াজ, গা-ছমছম করে উঠল। দরজার ওপরে উঁকি দিয়ে অবাক হলাম। এত ঘন জঙ্গল এখানে? অন্ধকার, আবছায়া চাঁদের আলো জঙ্গলের পাতায় পড়ে রূপোর মতো চিকচিক করছে।

ভাবলাম, দেখি বাইরে গিয়ে। এ সুযোগ তো সবসময় আসে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ চলে গেছে, একটু এগিয়ে চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম একটা কাঠের খাম্বা। লম্বায় প্রায় দু'মানুষ সমান, গায়ে রকমারি নকশা আঁকা—পাখি, মাছ, কান্ডারু, শিকারের দৃশ্য, স্বপ্নজগতের নানান কাহিনি। টোটম পোল! এখানকার জনজাতিরা বিশ্বাস করে, এই জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড, সবই একটা স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের এক ভাঙ্গা টুকরো হলো আমাদের বাস্তব। সেই স্বপ্ন জগতের গল্প বলে টোটম পোল। সম্মুখে হাত রাখতে গেলাম খাম্বাটার ওপর। হঠাৎ একটা হিংস্র গর্জন বনের শান্ত পরিবেশটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। চমকে উঠে দেখলাম, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক তাসমানিয়ান টাইগার, থাইল্যান্ডিন। বিশাল দেহ, নেকড়ের মতো গড়ন, ডোরাকাটা দাগ গায়ে, হিংস্র চোখের দৃষ্টি। বন্য জানোয়ারদের থেকে চোখ সরাতে নেই, সরালেই ওরা আক্রমণ করে। জন্তুটার দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে একপা একপা করে পিছোতে লাগলাম। একটা গাছের আড়াল পড়ল, এই সুযোগ। পেছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় দিলাম। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, তখনো হাঁপাচ্ছি, এই শীতেও শরীর ঘামে ভিজ়ে গেছে।

সকালে স্নান করে প্রাতরাশ সেরে গেলাম স্থানীয় হাসপাতালে, আমার কাজ মূলত ওখানেই। ওদের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ম্যানেজার ডেমিয়েন, খুব হাসিখুশি মানুষ। কাজের ফাঁকে হাসপাতালের ক্যান্টিনে বসে কথা হচ্ছিল। সারা জীবন মেলবোর্নে কাটিয়ে ডেমিয়েন জীবন সায়াহ্নে এখানে এসেছে, শেষ জীবনটা এখানেই কাটাতে। জিজ্ঞেস করলাম, মেলবোর্নের মতো বড়ো শহর ছেড়ে এই জনবিরল জায়গায় কেন? ও বলল, এখানে ওর বাড়ি পাহাড়ের ওপর, আশেপাশে ফসল ফলানোর জন্য জমি আছে, বারান্দা থেকে দেখা যায় মারি নদী বয়ে চলেছে। এরকম একটা শান্তির আলায়, অথচ সেখান থেকে ওর অফিসে আসতে সময় লাগে মাত্র পনেরো মিনিট। এমন জীবন কি আর বড়ো শহরে পাওয়া যায়? ক্যান্টিনের সামনের মাঠে একটা বাচ্চা মেয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পরনে ভারী জ্যাকেট, রিমোট কন্ট্রোলে খেলনার প্লেন ওড়াচ্ছে। বোঁওওওও শব্দ করে লাল রঙের প্লেনটা মাঠের চক্কর কাটছে বারবার। ডেমিয়েনকে বলছিলাম গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা ও বলল,

—তাসমানিয়ান টাইগার? হয়তো ডিংগো দেখেছ।

ডিংগো অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুর। এককালে এদের পূর্বপুরুষ গৃহপালিত পোষা কুকুরই ছিল। কেন জানা যায় না, তাদের একটা অংশ ঘর ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীনতার আকর্ষণে?

—ডিংগো? স্পষ্ট দেখলাম গায়ে ডোরাকাটা দাগ....

—তাসমানিয়ান টাইগার এখানে কোথা থেকে আসবে? তাছাড়া সে তো কবেই, ইউরোপিয়ান সেটলমেন্টের সময়ই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

—আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু নিজের চোখে যে দেখলাম?

—অসম্ভব। তাছাড়া এখানে কোথাও কোনো টোট্টেম পোল নেই। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছ!

স্বপ্ন? হবেও-বা। থেকে থেকে ঝোড়ো বাতাস বইছে, খেলনার প্লেনটা তখন খাবি খাচ্ছে শূন্যে।

রাতের খাবার সেরে মোটোলে ফিরে প্রথমেই কটেজের পেছনদিকটা দেখে এলাম। আশেপাশে সতাই কোনো ঘন জঙ্গল নেই। আরও অবাক কাণ্ড, যে দরজাটা খুলে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, সেটার অন্যদিকে পাঁচিল! কাল রাতে তবে কী ঘটেছিল? স্বপ্ন? সেটাই ভালো, তাহলে ভয়ের কোনো কারণ নেই। বিছানায় যাবার আগে দেখে নিলাম, বন্ধ দরজাটা বন্ধই আছে। বিছানায় শুয়ে একটা বই খুললাম। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য গুহর জীবনী।

কী অসাধারণ একটা মানুষ ছিলেন, অথচ ইতিহাস তাঁকে একেবারেই ভুলে গেছে। ওড়িশা থেকে বিহার, প্রতিটি জায়গায় দেশজ রাজশক্তিশক্তিকে একত্র করতে পেরেছিলেন, গেরিলা

যুদ্ধে পদে পদে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন মোগল ফৌজকে। বঙ্গে প্রকৃতি, তার নদী ও তার বর্ষাঋতুকে কীভাবে অস্ত্র হিসাবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, সেটাও প্রতাপ দেখিয়েছিলেন। আকবর আর তার বাইশজন আমিরের বিশাল ফৌজকে হার মানতে হয়েছিল তার কাছে, পূর্বভারত হাতছাড়া হয়েছিল মোগলদের। একই সঙ্গে পর্তুগিজ আর্মাডাকেও রুখে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিশ্বস্ত নৌসেনারা রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে পর্তুগিজ জাহাজে উঠে সবার দফারফা করে একইভাবে নিঃশব্দে পালিয়ে যেত। যে পর্তুগিজ ইনকুইজিশনের বর্বরতার শিকার হয়ে গোয়ার সিংহভাগ হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছিল, সেই ইনকুইজিশনের চিহ্নও বঙ্গের ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই, সেটা শুধু এই মানুষটার জন্য! তারপরের ইতিহাসটা জানি, ওটা আর পড়তে ইচ্ছে করে না। আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর বুঝেছিল, হিন্দুকে শুধু হিন্দুই মারতে পারে। জাহাঙ্গীর কাজে লাগালো মানসিংহকে, আর মানসিংহ কাজে লাগালো ভবানন্দ মজুমদারের মতো বঙ্গের বিশ্বাসঘাতকদের। বইটা পাশে রেখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

দমকা বাতাসে একরাশ ধুলো উড়ে এল। তার সঙ্গেই বর্ষার ফলার মতো হিমশীতল জলকণার বৃষ্টি শুরু হলো আকাশ থেকে। কালো আকাশ, বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কানে তালি ধরা শৌঁ শৌঁ গর্জন, উথালপাথাল হচ্ছে গাছগুলো। কিছুতেই মনে করতে পারছি না, কী করে এখানে এলাম। ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলাম নাকি? মনে পড়ছে না কেন? এটা কোন জায়গা? বৃষ্টির হিমশীতল ফোঁটাগুলো যেন বর্ষার ফলা, গায়ে দাগ ধরিয়ে দিচ্ছে। একটা বড়ো গাছের নীচে আশ্রয় নিলাম, এরই মধ্যে বেশ খানিকটা ভিজে গেছি। কী ঠাণ্ডা বৃষ্টি, হি হি করে কাঁপুনি দিচ্ছে। ধোঁয়ার মতো জলকণার পুঞ্জ ঢেকে আছে চারিদিক, দুহাত দূরের গাছগুলোকেও দেখে মনে হচ্ছে ছায়া-ছায়া বিদেহী প্রেত। পকেট হাতড়ে মোবাইল বার করে চেক করলাম, কোনো রিসেপশন নেই।

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির প্রকোপ একটু কমল, হাঁটতে শুরু করলাম। ঘন জঙ্গল! পথ চলা যায় না, পা জড়িয়ে যায় বুনো লতায়, দুটো গাছের মাঝে একটা মানুষ গলে যাবার যথেষ্ট জায়গা নেই। অনেক কষ্টে কিছুক্ষণ এগোনোর পর একটা পায়ে চলার রাস্তা দেখলাম, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঐক্যে বেঁকে চলে গেছে। পায়ে চলার রাস্তা যখন, এই পথে চললে একটা লোকালয়ে নিশ্চয়ই পৌঁছোব। মোবাইলে কম্পাস

আছে, সেটা বলছে রাস্তাটা উত্তর দিকে গেছে। এটা দেখা জরুরি, নাহলে যদি রাস্তাটা একই জায়গায় ঘুরপাক খায়, তাহলেও বুঝতে পারব না। জঙ্গলে পথ চেনা কঠিন।

একঘণ্টা হাঁটার পর পায়ে চলা পথটা এখন অনেক স্পষ্ট। কাছে নিশ্চয়ই কোনো খামার কিংবা কোনো খালি জায়গা আছে। একটা অদ্ভুত জিনিস এবার নজরে পড়ল। আশেপাশের গাছের ডাল থেকে কীসব যেন বুলছে। কাটুম-কুটুম। ভাঙ্গা গাছের ডাল দড়ি দিয়ে বেঁধে নানান রকম মানুষের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল, সঙ্গে বিকট গন্ধ। এটা কী? গলায় ফাঁস, উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে বুলছে একটা মরা ক্যান্সার! পেট আড়াআড়িভাবে চেরা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে বুলছে। রক্ত পড়ছে টপটপ করে। তখনই খেয়াল করলাম, গাছের গোড়ায় আঁকাবাঁকা হরফে কী যেন লেখা আছে, লাল কালিতে। এসব কী? কোনো জাদু-টোনা? গাছের গুঁড়িটা যেন কীরকম। ঠিক যেন একটা মুখ খোদাই করা। বুড়ো মানুষের মুখ। গাছের ডালে, রাস্তার ধারে, জায়গায় জায়গায় সবুজ থকথকে কীসব যেন লেগে রয়েছে। বিস্ত্রী দুর্গন্ধ। ঠিক এই সময় দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। ধূপ ধূপ ধূপ, গুব গুব গুব। মাটি কাঁপছে। যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, দৌড়ে আসছে এদিকেই। কী ওটা? ভয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়লাম।

অনেকটা পথ দৌড়ানোর পর খেয়াল করলাম, ধূপধাপ শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। তার বদলে বুকের মধ্যে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবছিলাম, এখানে এলাম কী করে? শেষ মনে পড়ছে, গত রাতে কটেজে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। যশোরের রাজা প্রতাপের কথা। আর ভাবছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির কথা। অখণ্ড ভারতের কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গ, সুজলা সুফলা সুমধুরভাষিণী বঙ্গের ভাগ্যে এমনটা কেন হলো? ভাবছিলাম, ছোটো ছোটো ঘটনা কীভাবে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কেন সম্ভাবনা অন্ধুরেই মরে যায়। কেমন হতো, যদি শশাঙ্কর সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতো? কিংবা যদি পাল সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে যেত? বঙ্গালসেন যদি নাথযোগীদের সঙ্গে শত্রুতায় না জড়াতেন, যদি যশোরের প্রতাপাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতার শিকার না হতেন, তবে ইতিহাসটা কেমন হতো? চৈতন্যদেবের প্রভাবে দোদগুপ্রতাপ রাজকর্মচারী সাগির মালিক আর দবির খাস বৈষ্ণব হয়েছিল। রূপসনাতন আর যবন হরিদাসের সঙ্গে সুলতান হোসেন শাহও যদি বৈষ্ণব হয়ে যেত, তাহলে বঙ্গ সেই যুগেই রাহুমুক্ত হতো। সেটা তো হলোই না, উলটে আমরা চৈতন্যদেবকে হারালাম। কেন বঙ্গের ভাগ্যে বারবার এরকম ঘটে? কেন? কেন? বাঙ্গালি কেন বারবার ট্রাজিক হিরো হয়েই রয়ে যায়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতকে স্বাধীন করার একটা বড়ো পরিকল্পনা হয়েছিল,

রাসবিহারী বসু আর বাঘা যতীনের নেতৃত্বে। একটামাত্র লোকের বিশ্বাসঘাতকতা সেটাকে বানচাল করে দেয়। বঙ্গের আজকের পরিস্থিতি কেমন হতো, যদি ১৯১৭ সালে রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হতেন?

ঝোড়ো বাতাস বইছে, একরাশ কুয়াশা জড়ো হয়েছে। এত কুয়াশা আসছে কোথেকে? চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, এক হাতের দূরত্বেও কিছু দেখা যায় না। অন্ধকারে হাতড়ে এগোবার চেষ্টায় দু'একবার গাছের গুঁড়িতে ঠোঁকর খেয়ে গেল মাথাটা। হাত-পাও বোধহয় ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে। হঠাৎ করেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল, কুয়াশাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা বিশাল একটা সরোবর। পাড় ধরে একসারি সারস দাঁড়িয়ে রয়েছে। একরকম দেখতে, সবাই একইদিকে মুখ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটার সঙ্গে অন্যটাকে তফাত করা যায় না। সরোবরের পাড়ে বেড়ায় ঘেরা বড়ো একটা ফাঁকা জায়গা। খামার নিশ্চয়ই। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, কাঠের তৈরি। একতলা বাড়ি, ওপরে চিলেকোঠা। এই বাড়িটাকেই কি সরাইখানার জানালা দিয়ে দেখছিলাম? কই, আশেপাশে তো সরাইখানাটা দেখা যাচ্ছে না। এটা কি তবে একইরকম দেখতে অন্য কোনো বাড়ি?

যাক, এযাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম। একটু ইতস্তত করে, তারপর বেড়ার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বিরাট বড়ো, কিন্তু বাড়িটা ভাঙাচোরা, মনে হচ্ছে যেন ফুঁ দিলে ভেঙ্গে যাবে। বাড়ির সামনে অনেকগুলো শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু, ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের, অবহেলায় এদিক-ওদিক পড়ে রয়েছে। সবুজ শ্যাওলা জমা দেবদূত, পরি। ভাঙ্গা ফোয়ারা আছে একটা, জল নেই তাতে। এককোণে তিনটে দানবের মূর্তি। একইসঙ্গে দানব আর দেবদূত? কিছু একটাতে হেঁচট খেতে গিয়ে সামলে নিলাম। নীচু হয়ে কুড়িয়ে দেখি, কাদায় মাখামাখি একটা খেলনার মডেল প্লেন, লাল রঙের। জং ধরা, দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরোনো।

—হ্যালো মাইট!

চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ধারালো মুখের গড়ন, লালচে-সাদা চামড়ায় লাল-লাল বুটি, চোখে ভোলাভোলা সারল্য। পরনে গামবুট, মলিন প্যান্ট, জ্যাকেট, মাটি লেগে আছে তাতে। হাতে একটা বই। কারোর হাতে বই দেখলেই কী বই সেটা দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লোকটার হাতের বইটার মলাটে কী লেখা আছে, সেটা পড়তে পারলাম না। এটা কি ইংরিজি হরফ নয়?

—লস্ট?

—ইয়ে, মানে, হ্যাঁ, লস্ট। সেই কখন থেকে হাঁটছি।

—কোথায় যাবে?

—ওডোঙ্গা, শহরের প্রান্তে যে মোটেলটা আছে, সেটাতেই উঠেছি....

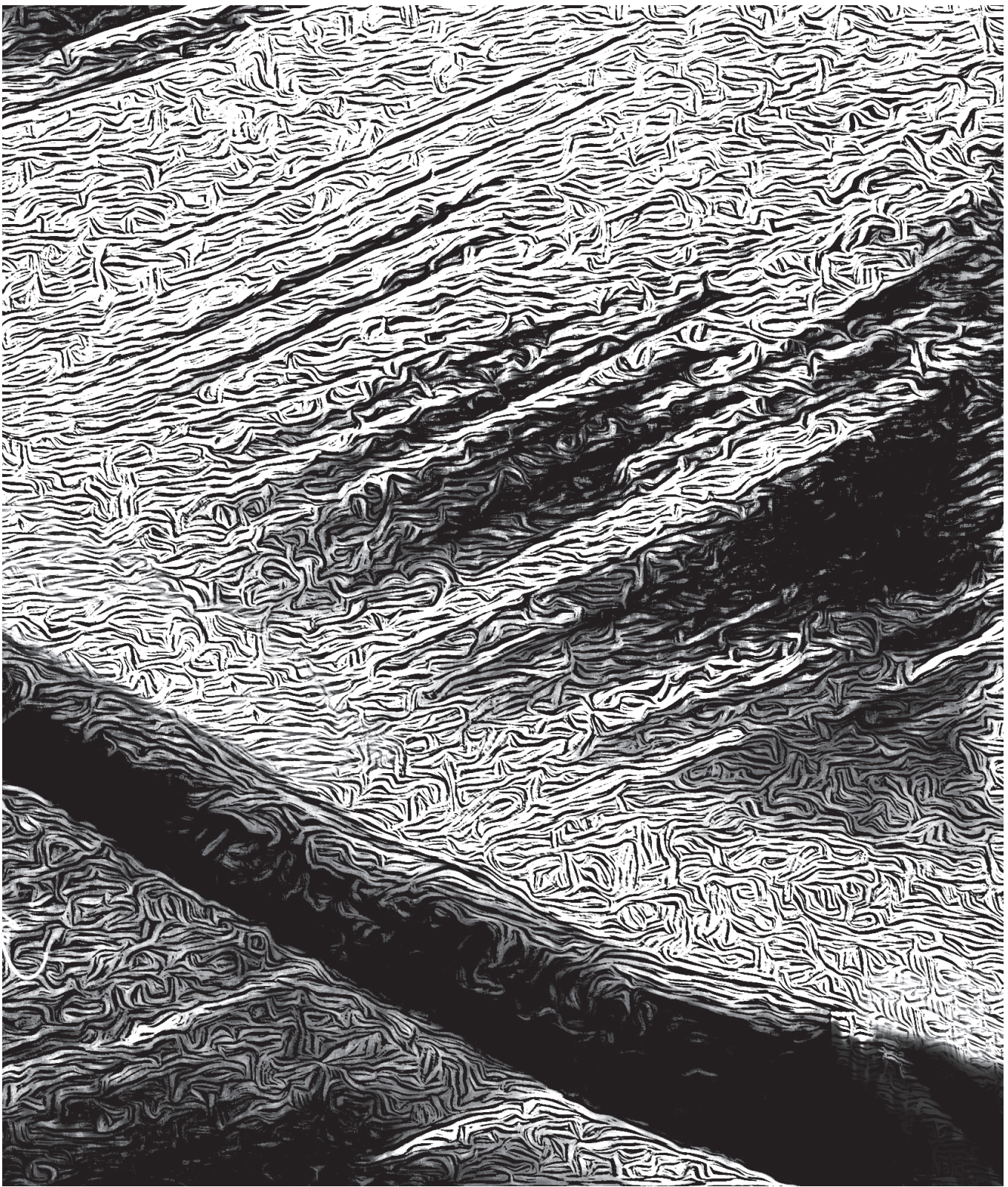


—ওয়েল মাইট, ওডোঙ্গা তো এখান থেকে অনেক দূর।
তুমি এখন মারী নদীর অন্য পাড়ে আছো। এই জায়গাটার নাম
বেথান্সা।

হায় ভগবান! বেথান্সা কোথায়, সেটা আমি জানি। সোজা
পথে তিরিশ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা, এখানে এলাম কী
করে?

—নো ওয়ারিজ মাইট। আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে
দিয়ে আসব। তার আগে আমার বাড়ি চলো। তোমার হাল তো
দেখছি খুবই খারাপ, হাত পা ছড়ে গেছে। চলো, পরিষ্কার হয়ে
কিছু খেয়ে নেবে। তারপর আমি তোমাকে তোমার মোটোলে
পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেউ কি ওপর থেকে আলো ফেলছে? হ্যাঁ, বাড়িটার



চিলোকোঠা থেকে কেউ এদিকে আলো ফেলছে। ক্ষীণ আলোর
সিল্যুটে দেখতে পেলাম, জানলায় দাঁড়িয়ে, এদিকেই তাকিয়ে
আছে একটা ছায়ামূর্তি। খর্বাকৃতি, একটু সামনে ঝুঁকে আছে।

—তুমি কি ইন্ডিয়ান?

—হ্যাঁ।

—ইন্ডিয়ার কোথাকার? কোন সিটি?

—ক্যালকাটা। আপনি ইন্ডিয়া গেছেন কখনো?

—আমার জন্মই তো ইন্ডিয়ায়। বাবা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান
আর্মিতে ছিল। তোমাদের স্বাধীনতার পর আমরা সবাই
ইংল্যান্ডে চলে এলাম, তারপর আর কোনদিনও যাওয়া হয়নি।
বাবা অবসর নিল, সাসেক্সে বাড়ি করল। বেশিদিন বাঁচেনি
তারপর। সাসেক্সের ওই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সহ্য

করতে পারেনি বাবা। তারপর সবকিছুই কেমন যেন হয়ে গেল। বাবা মারা যাওয়ার পর মা অন্য একটা লোকের সঙ্গে চলে গেল, আমার লেখাপড়া আর এগোলো না। কিছুদিন ট্রাভেলিং সেলসম্যানের কাজ করলাম, খুব একটা সফল হইনি। সেই সময় সবাই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিল। আমিও চলে এলাম, ফ্রি জাহাজে চড়ে। অস্ট্রেলিয়া সরকার ফ্রি জমি দিল, এই জঙ্গলে। শহরে লোক আমি, চাষবাস কিছুই জানতাম না। প্রথমদিকে খুব কষ্ট হয়েছিল। সেই থেকেই এই খামারে আছি। বাড়িটা বানিয়েছি, চাষবাস করি, মাছ ধরি। কিছু মুরগি আছে, ডিম দেয়।

—একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না?

—বলো?

—আপনার হাতে এটা কী বই?

—কেন? ক্যান্টারবেরি টেলস, চসারের। পড়েনি?

—না, মাপ করবেন। আমাদের দেশে ডিকেন্স, শেক্সপীয়ার পর্যন্ত চল আছে, কিন্তু চসার? শুনেছি ও খুব পুরনো ইংরিজি, দুর্বোধ্য।

—হ্যাঁ, ভাষাটা পুরনো ধাঁচের। কিন্তু চসার আমার ভীষণ প্রিয়। আমার প্রথম মাইনে দিয়ে চসারের পুরো সেট কিনেছিলাম, কালেক্টার্স এডিশন, সোনার জলে বাঁধানো। সাসেক্স থেকে চলে আসার সময় অনেক কিছুই ফেলে এসেছিলাম, কিন্তু ওগুলো ছাড়িনি।

এবার আবার ভালো করে মলাটটা দেখলাম। চমকে উঠলাম। কষ্ট হয় পড়তে, কিন্তু হরফগুলো অজানা নয়। হ্যাঁ, মলাটের ওপর সোনার জলে লেখা আছে, ক্যান্টারবেরি টেলস, বাই জিওফ্রে চসার। কিন্তু হরফগুলো সব উল্টো। ঠিক যেন আয়নায় প্রতিফলন। ভুল দেখছি নাকি? হবেও বা। শারীরিক আর মানসিক চাপ, দুটোই তো কম হয়নি। বাড়ির বারান্দায় বসে এক বৃদ্ধা। আর একটা মেয়ে। বৃদ্ধার বয়স ভদ্রলোকের মতোই হবে, মেয়েটা বয়ঃসন্ধির। মেয়েটার মুখটা অবিকল সেই শ্বেতপাথরের পরিটার মতো। এই মেয়েটাকেই হাসপাতালের ক্যান্টিনের মাঠে দেখেছিলাম না? এটাও কি মনের ভুল?

—আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে।

মেয়ের সঙ্গে বাবা-মা'র বয়সের অনেক তফাত।

—গুড ইভিনিং। বললাম।

মহিলা বোধহয় কানে শোনে না। কিংবা বোবা। পাথরের মতো শক্ত মুখ, কোনো ভাবান্তর নেই। মেয়েটাও প্রায় তাই, আমাকে দেখে খেয়াল করল না। একটা পুতুল নিয়ে নিবিষ্ট মনে কী যেন করে যাচ্ছে।

—এস, ভেতরে এস। আমি তোমাকে টাওয়েল দিচ্ছি, বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এস।

ঘরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তে রীতিমতো অবাক হলাম। দামি কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ফোটা বুলছে সে

দেওয়ালে। তার একটা ছবি এক অচেনা ব্রিটিশ যুবকের, পরনে সামরিক পোশাক। কিন্তু তার পাশের ছবিটা? বার কয়েক চোখ রগড়ালাম, আমি কি ভুল দেখছি? এই ছবিটা বঙ্গ তথা ভারতের অনেক বাড়িতেই দেওয়ালে বুলতো এককালে।

—ছবিটা দেখে অবাক হলে নিশ্চয়ই? বলল বুড়ো লোকটা।

—হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। ইনি তো.....

—আমার বাবার কাছে শুনেছি। তোমাদের নেতা।

—তার ছবি, এখানে? মানে....

—এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, বাবার কাছে শুনেছি।

তখন বিশ্বযুদ্ধের সময়, স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তোমাদের দেশ। ব্রিটিশ সরকার তোমাদের সব নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরে তারপর তাদের ওপর অত্যাচার করে মনোবল ভেঙে দিত, আর এইভাবে এক-এক করে তাদেরকে ব্রিটিশ পক্ষে নিয়ে আসছিল। তারপর তাদের ছেড়ে দিত, যাতে তারা তোমাদের স্বাধীনতার চেষ্ঠাকে ভুলপথে চালিত করে। অনেকের সঙ্গেই সফল হয়েছিল। এই লোকটা ছিল ব্যতিক্রম। অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে পড়ল, কিন্তু মনোবল ভাঙল না।

লোকটাকে মগজ ধোলাই করার সব চেষ্ঠাও ব্যর্থ হলো। ইতিমধ্যে তোমাদের দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠেছে, বাধ্য হয়ে লোকটাকে জেল থেকে বের করে নিজের বাড়িতেই বন্দি রাখার ব্যবস্থা হলো। পরিকল্পনা ছিল, লোকটাকে বাড়িতেই ধীরে ধীরে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হবে। এই সময় গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর এল, লোকটা বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। আমার বাবা তখন ব্রিটিশ সরকারের প্রথম সারির গোয়েন্দা। তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল লোকটার ওপর নজর রাখার। অবাক কাণ্ড, লোকটা আমার বাবার সঙ্গে গোটা প্রশাসনেরই চোখে ধুলো দিয়ে পালাল। আমার বাবা লোকটাকে ধাওয়া করেছিল, কলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত। লোকটা বারবারই বাবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। আমার বাবা ছিল ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে ডাকসাইটে গুপ্তচর, তাঁর জীবনকাহিনি নিয়ে কত গল্প লেখা হয়েছে, সিনেমা হয়েছে। দুঃখের কথা, তোমাদের ওই নেতা বাবাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়েছিল। এই দুঃখ, এই অপমান বাবা সহ্য করতে পারেনি। বিশ্বযুদ্ধের পর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকত বাবা, দিনরাত তোমাদের নেতার এই ছবিটাকে দেখত। ওইভাবেই চেয়ারে বসে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে মারা গেল একদিন। বাবা মারা যাওয়ার পর গুঁর ছবিটা তোমাদের নেতার ছবির পাশেই টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে এরকম চলে আসছে। বাবা, আর বাবার চিরশত্রু, একই সঙ্গে। কিন্তু তোমাদের দেশের লোকেদের বলিহারি! আমার বাবাকে নিয়ে হলিউড কত সিনেমা বানাল। জেমস বন্ডের সিনেমা দেখেছ নিশ্চয়ই? কিন্তু যে লোকটা আমার বাবাকে হারিয়ে দিল, তাকে নিয়ে তোমাদের

বলিউড কই কোনো ছবি বানাল না তো? শুনেছি তোমাদের বলিউড নাকি হলিউডের থেকেও বেশি ছবি বানায় প্রতি বছর....

এটা বোধহয় এদের বসবার ঘর। পুরনো খাঁচের বাড়ি। ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার। পিয়ানো, ওপরে স্ফটিকের ফুলদানি। ফুলদানিতে একরাশ শুকনো ফুল। একটা বইয়ের আলমারি, অনেক বই তাতে। দেওয়ালে ওয়ালপেপার, তাতে গোলাপ ফুলের নকশা। গোলাপ ফুলের ছড়াছড়ি মেঝের কার্পেটেও। কেন জানিনা, চারিদিকে এত গোলাপফুল দেখে গা গুলিয়ে উঠল। ঘরের ভেতর বোটকা গন্ধ। কার্পেটটা ময়লা, পা দিতে অস্বস্তি হচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়তো শারীরিকভাবে অক্ষম, এত বড়ো বাড়ির দেখভাল করা সহজ নয়। কিন্তু মেয়েটা? এরকম নোংরার মধ্যে থাকে, পরিষ্কার করার চেষ্টা করে না? পকেট থেকে বার করে মোবাইলটা দেখলাম, কোনো রিসেপশন নেই। হাতে একটা তোয়ালে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

—এই সামনে করিডোরের পেরিয়ে হলঘর পাবে। হলঘরের পরেই বাথরুম।

—এখানে কি মোবাইলের কোনো রিসেপশন নেই?

—মোবাইল? ভদ্রলোক কেমন অবাক চোখে তাকালেন।

—মোবাইল, ফোন। আপনার কি ফোন আছে?

—না। ওসব ফোনটোন আমি ব্যবহার করি না। করবই-বা কেন? এই খামারের বাইরে কাউকেই আমি বিশেষ চিনি না। এক দিদি ছিল ইংল্যান্ডে, আর মা, সে ছাড়া আর আর কোনো আত্মীয় নেই। ইংল্যান্ড ছেড়ে আসার পর তাদেরও কারোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। হয়তো সবাই মরে ভূত হয়ে গেছে। যাও যাও, ফ্রেশ হয়ে নাও, আমরা বারান্দায় খাবার সাজাচ্ছি। ফিল ফ্রি মাইট, বাড়িতে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।

হঠাৎই একটা খটকা লাগল। বাড়িতে আর কেউ নেই মানে? তবে চিলেকোঠা থেকে কে আলো ফেলছিল? জিজ্ঞেস করলাম।

—চিলেকোঠা থেকে আলো? ভুল দেখছ নিশ্চয়ই। চিলেকোঠায় কেউ থাকে না, বহুকাল ওটা ব্যবহার হয় না। ইন ফ্যাক্ট, চিলেকোঠার সিঁড়ি তো ভাঙ্গা, কারও পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

চোখের ভুল? হবেও-বা! লোকটার দেখানো রাস্তায় করিডোর ধরে এগোলাম। অন্ধকার করিডোর। এক জায়গায় ছাদ থেকে একটা শিকল ঝুলছে। করিডোরের পেরিয়ে খাবার ঘরে পৌঁছে দেখি, সেরকমই ওয়ালপেপার, কার্পেট। গোলাপ ফুলের নকশা। ডাইনিং টেবিলের ওপর স্ফটিকের ফুলদানি। এই ফুলদানিতেও একরাশ শুকনো ফুল। অবাক কাণ্ড। কেউ কি এরকমভাবে শুকনো ফুল সাজিয়ে রাখে? ঘরগুলো কেমন যেন অন্ধকার। গা-ছমছমে। জানলা-দরজা ছোটো ছোটো।

জানলাগুলোয় লাল কাচ। বাইরের আলো সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢুকে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি করেছে। ঠিক যেন নরকের আগুন। কোথাও একটা খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

বাথরুমে ঢুকে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে, চোখে-মুখে-ঘাড়ে জল দিলাম। বাথরুমে কোনো আয়না নেই। হাত-মুখ মুছতে মুছতেই শুনতে পেলাম, বাইরে একটা আওয়াজ। চাপা ভোগুনির আওয়াজ। কেউ কি অসুস্থ? এখনো পর্যন্ত একটা আয়না দেখিনি কোথাও। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার পর আয়নায় মুখটা না দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। ভাগ্য ভালো, এত নোংরার মধ্যেও তোয়ালেটা অন্তত পরিষ্কার। গোঙানির আওয়াজটা ধীরে ধীরে কান্নার আওয়াজে পরিণত হচ্ছে। কে কাঁদছে? কোনো মেয়ের গলা কি? সেই মেয়েটা? নাকি বুড়িটা?

হঠাৎ করেই ঘরের মধ্যে সব চুপচাপ হয়ে গেল। তখনই খেয়াল করলাম, বাইরে থেকে অনেক রকম শব্দ ভেসে আসছে। বাড়ির শব্দ, গাছপালার উত্থাল পাখাল হওয়ার শব্দ, আলগা জিনিসপত্র উড়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ার শব্দ। তার সঙ্গেই টালির চালে একশো বাজনাটার মৃদঙ্গ চাঁটির ধ্বনি উঠল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এটা সেই খাবার ঘরটা নয়, যেখান থেকে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। এটা একটা খোলা বারান্দা। সম্ভবত এটা বাড়ির পেছনদিক, বারান্দার পেছনে ঘন জঙ্গল। বাঁদিকে একটা ঢালু জমি, সেদিকটায় জঙ্গল নেই। কিন্তু সে অভাব পুষিয়ে দিয়েছে লম্বা লম্বা আগাছা। ঘন ঝোপ, জায়গায় জায়গায় কোমর পর্যন্ত উঁচু। বেগুনিরঙের আকাশ, তুমুল শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। রাগে মাথা ঝাঁকচ্ছে গাছগুলো। ডেকের ওপর একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। এককোণে উনুন। এখানে এসে পড়লাম কী করে? বাথরুমে কি দুটো দরজা ছিল? একটা খাবার ঘরের সঙ্গে, আরেকটা বারান্দার সঙ্গে? বোধহয়। রেলিং থেকে একটা পাখির খাঁচা ঝুলছে, খালি। না, খালি তো নয়! খাঁচার ভেতরে এটা কী? একটা মরা পাখির কঙ্কাল, চিত হয়ে পড়ে আছে। গা গুলিয়ে উঠল। আকাশজুড়ে বেগুনি অন্ধকার, দিন না রাত বোঝা যাচ্ছে না। কী হবে এখন? এই বৃষ্টিতে বেরোবো কী করে?

ক্ষীণ আওয়াজ, পাশের ঘর থেকে আসছে। কেউ কি গান গাইছে? ডেকের পাশের দরজাটা দিয়ে ঢুকে দেখি, এই ঘরটাও আগে দেখিনি। এঘর ওঘর খুঁজতে লাগলাম। এ বাড়িতে নিশ্চয়ই আরও অনেক লোকজন থাকে! এইসব হাসি, কান্না, গান, এসব কে করছে? বাড়িটা যেন গোলকধাঁধা। ওপরে চিলেকোঠা রয়েছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার সিঁড়ি নেই কোথাও। বাড়ির লোকজনেরা সব গেল কোথায়? এইতো, এটা একটা

শোবার ঘর। কেউ আছে এটাতে। সেই মেয়েটা, যাকে বাইরে দেখেছিলাম। কিন্তু মেয়েটা তো বাইরে বারান্দায় খেলছিল, এখানে এল কী করে? ভদ্রলোকের দুটো মেয়ে নয় তো, একরকম দেখতে, যমজ? তা কী করে হয়, ভদ্রলোক তো বললেন বাড়িতে আর কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে মেয়েটা একা একা ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে, গেয়ে চলেছে। ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে। হুম হুম, হুম হুম, ইন অ্যান্ড আউট, হো! হুম হুম, হুম হুম, ইন অ্যান্ড আউট, হো! সুরটা খুব চেনা। এটা কি কোনো কেল্টিক পল্লীগীতি? মনে হচ্ছে আগে কোথাও শুনেছি। ঘরের একপাশে একটা বিছানা, বিছানার চাদরে বিচিত্র সব নকশা। কোথায় যেন দেখেছি এরকম নকশা। খুব হালেই দেখেছি। যেকোনো শোবার ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিল বা আয়না থাকা স্বাভাবিক, এঘরে সেসব কিছুই নেই। এই বাড়িতে কোথাও কোনো আয়না নেই কেন? সিলিং থেকে অনেক দড়িদড়া ঝুলছে। সেসব থেকে ঝুলছে অনেক কাটুম-কুটুম। এবার মনে পড়েছে, বিছানার চাদরের নকশাগুলো কোথায় দেখেছি। জঙ্গলের মধ্যে, সেই গাছের ওপর রক্ত দিয়ে আঁকা নকশাগুলো, হুবহু এক! মেয়েটা এবার আমাকে খেয়াল করল, নাচ থামল।

—গুড ইভিনিং! বললাম।

—ইভিনিং! কে তুমি?

—আমি এই কাছেই কাজে এসেছি। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, তোমার বাবা.....

—বাবা? আমার তো কোনো বাবা নেই!

—মানে? এই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা, এরা তোমার বাবা মা নয়?

—না। এরা অবিকল আমার বাবা মার মতো দেখতে।

আসলে শয়তান এদের পাঠিয়েছে, আমাকে বশ করতে। কিন্তু পারবে না। জানো তো, আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেল আমাকে কানে কানে সব বলে দেয়। সেই বলেছে, এরা খারাপ লোক। এদের খুন করে ফেলা উচিত। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

গার্ডিয়ান এঞ্জেল, মানে দেবদূত কানে কানে বলে দেয়? মেয়েটা বদ্ধ উন্মাদ! সিজোফ্রেনিক! এর সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তাছাড়া, শুধু শুধু এখানে সময় নষ্ট করছি কেন?

—বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে জানো? জিজ্ঞেস করলাম।

—ওই তো, ঐ দরজাটা দিয়ে বেরোলেই সামনে করিডোর, সেটা দিয়ে এগোলেই বসার ঘর, তারপরেই বারান্দা।

ঠিক তো। করিডোরটা চিনতে পারলাম, এটা দিয়েই তো বসার ঘরে পৌঁছেছিলাম। তাহলে এতক্ষণ এই করিডোরটা খুঁজে পাইনি কেন? মোবাইলে আবার চেষ্টা করলাম, এখনো কোনো রিসেপশন নেই। ধুন্তেরি! করিডোরের অন্যপ্রান্তে বুড়ো

লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে এগিয়ে এলো।

—এস, এস। বাইরে বারান্দায় খাবার বাড়া হয়েছে।

—খিদে খুব একটা পায়নি আমার। বরঞ্চ তাড়াতাড়ি মোটেল ফিরতে পারলে ভালো হতো।

—বাইরে কী বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখেছ? এই বৃষ্টিতে যাবে কোথায়? তারচেয়ে বরং খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো, বৃষ্টি থামলে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে চমকে গেলাম। সেই মেয়েটা তো এখানে বসে আছে! এম্ফুনি মেয়েটাকে ভেতরের ঘরে দেখলাম না? মেয়েটা আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারল না। পাথরের মতো মুখ করে টেবিলে বসে আছে, সেই বুড়ি মহিলার পাশে। উল্টোদিকের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। খাবারের আয়োজন সামান্যই। ঘরে বানানো মাংসের পিঠে, বালসানো আলু, স্যালাড। খিদে পেয়েছিল, তবু তৃপ্তি করে খেতে পারলাম না। কোথা থেকে যেন একটা বিস্মী পচা গন্ধ ভেসে আসছে। তার ওপর এই মা মেয়ে। খাবার টেবিলে সামনে চেয়ারে যদি দুজন অচেনা লোক পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকে, কোনো কথা না বলে, তাহলে অস্বস্তি হয় না? মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম, সামনের পুরো দৃশ্যপট জুড়ে প্রকৃতি যেন মাতলামো শুরু করেছে। আকাশের ছাদ বোধহয় ফুঁটো হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামার নাম নেই। কালো জল সরোবরে, দূরের জঙ্গলের পাগলের মতো মাথা নেড়ে না-না বলছে।

বেগুনি আকাশ বারবার আলো হয়ে যাচ্ছে। বেগুনি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করলাম। ওরা তিনজনই বাঁ হাত দিয়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য!

বুড়ি আর তার মেয়ে খাওয়া শেষ করে ভেতরে চলে গেছে। আমি আর সেই ভদ্রলোক এখনো বসে আছি বারান্দায়। প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল, বৃষ্টি এখনো সমানে চলছে। এরকম বৃষ্টি তো কই মেলবোর্নে হয় না? জঙ্গলের বৃষ্টি কি অন্যরকম? ভদ্রলোক বলছিলেন,

—এই জঙ্গলে থাকি বটে, কিন্তু পৃথিবীর খবর এখনো কিছু কিছু রাখি। বিশেষ করে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে একটা আগ্রহ তো রয়েছে। আচ্ছা বলো তো, আরাকান আর্মি সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা? এদের সঙ্গে তোমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

—সে কী? আজাদ হিন্দ ফৌজ তো আশি বছর আগের কথা। তাছাড়া তাদের সত্তর শতাংশ সেনা মারা গিয়েছিল,

বাকিরা আত্মসমর্পণ
করেছিল। তাই....

—লোকে তাই
বলে। কিন্তু আমার
মনে হয়, ওই সত্তর
শতাংশ আসলে মারা
যায়নি। ওরা
আত্মগোপন করে
ছড়িয়ে পড়েছিল সারা
এশিয়ায়, মিশে
গিয়েছিল স্থানীয়
বিদ্রোহীদের সঙ্গে।
আরাকান আর্মির
অতীত হয়তো সেখান
থেকেই.....

—এরকম কোনো
প্রমাণ তো নেই!
তাহাড়া, এখন এসব
ভাবতে পারছি না।
বড্ড ধকল গেছে
আজ, মাথাটা টিপিটিপ
করছে।

—তাহলে শুধু
শুধু বসে থেকে কী
করবে? তার চেয়ে

ভেতরে শোবার ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট নিতে পারো।

বিছানায় শুয়ে একটা আচ্ছন্ন তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল।
সেটা ভেঙ্গে গেল তীক্ষ্ণ গোঙানির শব্দে। সেই আওয়াজটা
ফিরে এসেছে? কী ব্যাপার? কে ওটা? বিছানা ছেড়ে তড়াক
করে উঠে পড়লাম। জানালার কাছে গিয়ে দেখি, বৃষ্টি এখনো
চলেছে। শব্দটা কোথেকে এল? তখনই ওপরে ছাদের কাছে
একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেলাম। কাঠের মেঝেয় কাঠের
পা ঘষটে চলার আওয়াজের মতো কিছু। ওপরে তো
চিলোকোঠা। সেখানে নাকি কেউ থাকে না? তবে আওয়াজটা
আসছে কোথেকে? জেদ চেপে গেল। বাইরে বেরিয়ে করিডোর
ধরে এগোতেই সামনে দেখলাম, ছাদ থেকে সেই শিকলটা
ঝুলছে? এটা তো আগেই দেখেছিলাম। কী মনে হলো, ধরে
টান দিলাম। অমনি ছাদের মধ্যে একটা ছোট দরজা খুলে গেল,
ওপর থেকে ভাঁজ করা একটা সিঁড়ি নেমে এল। সিঁড়িটা তো
বেশ অক্ষতই আছে। তবে যে লোকটা বলেছিল সিঁড়িটা ভাঙা?
এই বাড়িটাতে কে যে সত্যি কথা বলে, আর কে মিথ্যে, সেটা
বোঝা দায়! সাবধানে সিঁড়িতে পা রাখলাম। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ



গোলমাল আছে এই বাড়িটাতে। পালাতে হবে এখান থেকে।
দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। করিডোর দিয়ে
আন্দাজে এগোলাম সদর দরজার দিকে। চলতে চলতেই
মোবাইলটা বার করলাম। রিসেপশন ফিরে এসেছে কি? খুব
অন্ধকার এখানটায়। নাকি মোবাইলের কাচটা ঝাপসা হয়ে
আছে। কাছে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।

কানফাঁটানো একটা আর্তনাদে চমকে উঠে হাত থেকে
মোবাইলটা পড়ে গেল। বাইরে থেকে আওয়াজ এসেছে। কিছু
একটা গুণ্ডগোল হচ্ছে বাইরে। একাধিক গলার চিৎকার।
মোবাইলটা কুড়িয়ে নিয়ে বারান্দার দিকে দৌড়োলাম। বারান্দায়
পৌঁছে যে দৃশ্যটা দেখলাম, সেটা অতিবড়ো দুঃস্বপ্নেও কল্পনা
করিনি। টেবিল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, মৃত্যুযন্ত্রণায়
ছটফট করছে দেহদুটো। এর ওপর কেউ যেন ওদের কুপিয়ে
কুপিয়ে কেটেছে, সারা শরীরে অজস্র আঘাতের চিহ্ন। রক্তের
পুকুরের মধ্যে মেয়েটা ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে। মুখ, হাত,
জামা রক্তে মাখামাখি, বাঁ হাতে আধহাত লম্বা একটা রক্তমাখা
ছুরি। গুনগুন করে গেয়ে ছলেছে—হুম হুম, হুম হুম, ইন

করে উঠল সিঁড়িটা।
ধীরে ধীরে সিঁড়ি
বেয়ে ওপরে
উঠলাম। বিব্রী পচা
গন্ধ ঘরটাতে। বাইরে
হঠাৎ বৃষ্টির
আওয়াজটা বন্ধ হয়ে
গেল। নিঝাম, চুপচুপ
হয়ে গেল সব।
চিলোকোঠায় ঢুকে
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
থাকতে হলো, কিছুই
দেখা যাচ্ছে না। ধীরে
ধীরে অন্ধকার চোখে
সয়ে এল।
আলো-আঁধারিতে
দেখা যাচ্ছে, ঘরে
একটা বিছানা আছে।
সেই বিছানার ওপর
পড়ে আছে একটা
কঙ্কাল। তার কোমর
পর্যন্ত চাদর দিয়ে
ঢাকা। আতঙ্কে দম
বন্ধ হয়ে এল। বিরাট
কোনো একটা

অ্যান্ড আউট, হো। হুম হুম, হুম হুম, ইন অ্যান্ড আউট, হো।

ওহ্, কী বীভৎস দৃশ্য। চিৎকার করে প্রাণভয়ে দৌড়োলাম, জঙ্গলের দিকে। দৌড়, দৌড়, দৌড়। পার হয়ে এলাম সেই স্ট্যাচুগুলো। ওহ্ মাগো! চোখের সামেন জলজ্যাস্ত দুটো লোককে ডেডবডি হয়ে যেতে, জবাই করা মুরগির মতো ছটফট করতে আগে কখনো দেখিনি। ভীষণ গা গুলোচ্ছে, মনে হচ্ছে এফুনি অজ্ঞান হয়ে যাব।

টলতে টলতে এলোমেলো পায়ে বাগানের গেট খুললাম। দেখি, সেই মেয়েটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। সাদা ধপধপে পোশাক মেয়েটার, একটুও রক্তের দাগ নেই তাতে। হাতে লম্বা সেই ছুরিটা, সেটাতেও রক্ত লেগে নেই। মাথাটা ঘুরে উঠল, আতঙ্কে পা দুটো অবশ হয়ে এল। মেয়েটা বেড়ার ওপারে গেল কোন ফাঁকে?

—তুমি কি আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেল? তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? দুটো লোক আছে এই বাড়িতে...

ভয়ে চিৎকার করে উল্টোদিকে দৌড়োলাম। পার হয়ে গেলাম সেই মূর্তিগুলো, বাড়িটা, বাড়ির পেছনের ডেক, উনুন। লাফিয়ে বেড়া উপক্কে, জঙ্গল পাশ কাটিয়ে ওদিকের ঢালু জমিতে গিয়ে পড়লাম। হাঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেলাম। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে থামলাম। সারা গায়ে কাদা লেগে গেছে। মাটি ছেড়ে উঠতে গিয়ে আছাড় খেলাম। সামলে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়।

ঝোপঝাড় ভেঙ্গে অনেকটা দৌড়োনের পর মনে হলো, খামারটা থেকে এখন বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছি। মেয়েটা পিছু নেয়নি। বুক টিপটিপ করছে, হৃদপিণ্ডটা গলার কাছে আটকে গেছে। মোটেলে ফিরতে হবে, কিংবা কোনো লোকালয় খুঁজে বার করতে হবে। হাঁপাতে হাঁপাতে পা চালালাম, জোর কদমে। আবার ঘন জঙ্গল ধেয়ে এল চারিদিকে। আগেরবার উত্তরদিকে গিয়ে খামারটা পেয়েছিলাম, তাই এবার ঠিক উল্টোদিকে হাঁটা দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। গন্ধটা চেনা। সামনে একটা গাছ, গাছটাও খুব চেনা। গাছের ডাল থেকে একটা মরা ক্যাস্পার বুলছে। পেটটা আড়াআড়িভাবে চেরা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে বুলছে। আশেপাশের গাছের ডাল থেকে অজস্র কাটুম-কুটুম বুলছে। একটা আশঙ্কা মনে জমছে। ঝোড়ো বাতাস একরাশ কুয়াশা জড়ো করল। কয়েক পা এগোতেই সামনে দেখলাম, সেই ফাঁকা জায়গা, সরোবর, সেই ভাঙাচোরা বাংলো—প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। সরোবরের ধারে তিনটে সারস একইদিকে তাকিয়ে আছে।

—হ্যালো মাইট!

চমকে উঠলাম। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জীবন্ত!

দেজা ভু! আবার দৌড়োলাম। এবার পশ্চিমে। আবার সেই বিশ্রী গন্ধ। গাছের ডাল থেকে মরা ক্যাস্পার বুলছে, অজস্র

কাটুম-কুটুম। ঘন কুয়াশা, ফাঁকা জায়গা, ভাঙাচোরা কাঠের বাড়ি। সরোবর, সারস। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জ্যাস্ত। আবার দৌড়। বিশ্রী গন্ধ। গাছের ডাল থেকে মরা ক্যাস্পার, কাটুম-কুটুম। কুয়াশা, ফাঁকা জায়গা, ভাঙাচোরা বাড়ি। বৃদ্ধ। জ্যাস্ত। দৌড়। মাথা ঘুরছে। বিশ্রী গন্ধ। কাছের ডাল থেকে মরা ক্যাস্পার, কাটুম-কুটুম। কুয়াশা, ফাঁকা জায়গা, ভাঙাচোরা বাড়ি। বৃদ্ধ। জ্যাস্ত। দৌড় কতক্ষণ এরকম চলেছে, জানি না। রাত নামছে জঙ্গলে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে বিদ্যুৎ চমক আর ঝোড়ো বাতাস। দূরে কি সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, লোনা গন্ধও আছে বাতাসে। আর আছে গভীর একটা সুর। ডিজরিডুর সুর।

পা বসে যাচ্ছে পাক্কে, যেন চোরাবালি। কিন্তু কাঁধ জুড়ে অসীম এক শক্তির স্রোত বইছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি—একাকিহ, সঙ্গে শক্তি, অসীম শক্তির অনুভূতি। বিশেষত কাঁধে। শক্তির স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ছে কাঁধ থেকে সারা শরীরে। যেন একজোড়া অদৃশ্য ডানা পিঠ থেকে বেরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে ছড়িয়ে আছে অনেকদূর পর্যন্ত। পালক নেই সে ডানায়, চামড়ায় ঢাকা। প্রচণ্ড শক্তি সেই ডানাজোড়ায়। সামনে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। পা বসে যাচ্ছে, কিন্তু ডানাজোড়ার শক্তিতে ভর করে এগিয়ে চলেছি, ডিজরিডুর সুরের উৎস সন্ধানে। বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সামনে বিশাল সমুদ্র, তিনদিক বিস্তৃত। জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিক করছে, বড্ড চেনা লাগছে জায়গাটা। কন্যাকুমারী? কিন্তু কুমারী মন্দির নেই, থিরুভায়ুর নেই, বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল নেই, শুধু ধু ধু প্রস্তর প্রাস্ত, আর চন্দ্রমাত সাগরের অবিরাম আসাযাওয়া। এ যেন এক আদিম কন্যাকুমারী, সভ্য মানুষ পৃথিবীতে আসার আগের। পাথর ডিঙিয়ে সাগরের জলে নামলাম। অগভীর সমুদ্রে হেঁটে পৌঁছলাম বিবেকানন্দ রকে। এখন আমার সামনে থাকার কথা অসীম সমুদ্র, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মালা, তার মাঝে মাঝে স্বপ্রভ অগভীর সমুদ্র। অথচ কন্যাকুমারীর দক্ষিণে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো ভূখণ্ড নেই, এ তো অসম্ভব! তবে কী...প্রাচীন তামিল সাহিত্যে আছে, কন্যাকুমারীই ভারতের শেষ বিন্দু নয়, তারপরে ছিল বিশাল এক ভূমিখণ্ড, যার নাম কুমারী-গণ্ডপ। ভারতের সঙ্গে একদিকে আফ্রিকা, অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার যোগ ছিল এই ভূখণ্ড দিয়ে। এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের শেষে নাকি কুমারী-গণ্ডপ হারিয়ে গিয়েছিল চিরতরে।

ওপারে নারকেল গাছের সারি, সমুদ্রের পাড়ে আগুন জ্বলছে, তাকে ঘিরে গোল হয়ে নাচছে একদল মানুষ। তামাটে তাদের গাত্রবর্ণ, সাদা রং দিয়ে চিহ্ন আঁকা গায়ে মুখে, অনেকটা আমাদের সন্ন্যাসীদের মতো। অস্ট্রেলিয়ার জনজাতি এরা। শুনেছি এরকম অনুষ্ঠানকে এরা করবরী বলে। করবরীর মাধ্যমে

এরা প্রকৃতির সঙ্গে, সৃষ্টির সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। কে ওই লোকটা? ওদের মধ্যে বসে আছে, ডিজারিডু বাজাচ্ছে? এ কি সেই লোকটা, যাকে স্বপ্নে দেখেছি? যাকে সেদিন ফুটপাথেও দেখলাম? আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, আমার সৃষ্টির কোনো একটা পাতা হঠাৎ আলো করে দিয়ে গেল। কলকাতায় বাড়িতে বিরাট একটা ওয়েল পেন্টিং ছিল, আমার ঠাকুরদার। অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন তিনি। এককালের দুর্ধর্ষ সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামী, পরে ত্রিগুণা সেনের ভাবশিষ্য, যাদবপুরের গোল্ড মেডেলিস্ট ইঞ্জিনিয়ার।

—ঠাকুরদা?

লোকটা এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখলো। ঠাণ্ডা সে হাতের স্পর্শ, শরীর জুড়িয়ে গেল।

—কী দাদু, দুঃস্বপ্নের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলে? বলল লোকটা।

—হ্যাঁ, মানে...

—ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু দাদু, তুমি তো জেগেও দুঃস্বপ্নের মধ্যেই আটকে পড়ে আছো! একই কাজ বেজার মুখে করে চলেছ নিত্যদিন। মনে রেখো দাদু, আমরা হলাম স্বপ্নজগতের বাসিন্দা, পৃথিবীতে এসেছি শুধু অভিজ্ঞতার সন্ধানে। অভিজ্ঞতা আমাদের বিবর্তনের তাগিদে। যখন এই পৃথিবীতে আসি, সজ্ঞানেই আসি। সজ্ঞানেই ঠিক করি কোন বাবা-মার ঘরে, কোন পরিস্থিতিতে, কোন বংশাণু নিয়ে জন্ম নেব। পৃথিবী হলো আমাদের পাঠশালা, তার প্রতিটি কণা স্বপ্নজগতের চাবিকাঠি। প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানের ভাণ্ডার এখানে সাজানো আছে। কিন্তু বেজার মুখে পাঠশালায় দিন কাটালে সেসব কিছুই তো দেখতে পাবে না। তাতে কী লাভ, বলো দাদু? অনন্য এই পৃথিবী, অনন্য এর জীবন। স্বপ্নজগৎ আমাদের শেখায়, আমাদের রাস্তা দেখায়। শক্তি দেয়, জ্ঞান দেয়। আমাদের একটাই প্রার্থনা, যেদিন আমরা সেখানে ফিরে যাব, সেদিন যেন চক্র পূর্ণ হয়, আর আগামী চক্র যেন আরও বড়ো হয়। ওই দেখো ওদের। ওরা কোনোদিন চাষবাস করেনি, কলকারখানা বানায়নি, ব্যবসা করেনি। ওরা শুধু চেয়েছে রূপকার হতে, গান গাইতে, ছবি আঁকতে, কবিতা লিখতে, তারাদের ভাষা বুঝতে। চেয়েছে যাত্রী হতে। প্রকৃতি যা দেয়, তাই ওরা মাথা পেতে নেয়, বেশি লোভ করে না। নিজেদেরকে প্রকৃতির খণ্ডখণ্ড টুকরোর মালিক ভাবেন। তাই ওদের সমাজ, এই জীবজন্তু, গাছপালা, এই প্রকৃতি, এই ব্রহ্মাণ্ড; সবার সঙ্গে ওরা একাত্ম।

—তার মানে? তুমি কি বলছ, আমিও ওদের মতো সবকিছু ছেড়েছুড়ে....

—না, দাদু। তা আমি বলিনি। শুধু কোনটা সত্যি আর

কোনটা স্বপ্ন, সেটা চিনতে ভুল করো না। দুঃস্বপ্নটাকে দুঃস্বপ্ন বলে চিনে নিলেই তো আর সেটা কষ্ট দেয় না, তাই না দাদু? ওই দেখ, বৃষ্টি শেষ, সকাল হচ্ছে, রামধনু উঠছে। রামধনু হলো স্বপ্নজগতের বার্তাবহ, বুঝলে দাদু?

ঘুম ভাঙল। সত্যিই অন্ধকার কেটে গেছে। বৃষ্টি থেমেছে। বাইরে অনেক পাখি ডাকছে। কাচের দরজা ঠেলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম, আকাশ আলো করে কমলা রঙের সূর্য উঠছে। দূর থেকে ঝাপসা ছায়ার মতো সেই কাঠের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সত্যিই কি ওটা ওখানে আছে, নাকি আমার চোখের ভুল? একটা নয়, তিনটে রামধনু আকাশে। ভিজে বাতাস মাথায় ঠাণ্ডা স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল, মনে হলো যেন দাদুর আশীর্বাদ। মনের মধ্যে এখনো ডিজারিডুর সুর ভাসছে। ছোটোবেলায় ছবি আঁকতাম, আজ বহু বছর পরে আবার মনের আনন্দে পেন্সিল নিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে। কাচের স্লাইডিং দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে বসলাম। আগেরদিন এখানে শুধু পাঁচিলই দেখেছিলাম। আজ দেখলাম, পাঁচিলের ওপারে একটা বাগানবিলাস গাছ, বেগুনি ফুলে ভর্তি। তার ওপরে একটা পাখি বসেছে। ভোরের বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে ফুলগুলো, পাখিটা সেই তালে নেচে চলেছে। অন্যদিন হলে হয়তো পাখিটাকে খেয়ালই করতাম না। আজ কিন্তু ওটাকে খুব ভালো লেগে গেল। মনে হলো, আমার সঙ্গে কথা বলতেই ও এই গাছটায় এসে বসেছে। কোভিড অতিমারীর পর আজ প্রথম বাতাসে এত সুগন্ধ একসঙ্গে পেলাম। ভেজা ঘাসের গন্ধ, বরা পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ।

আজ মেলবোর্নে ফেব্রার দিন। মোটেল ছাড়তে হবে, হাতে বেশি সময় নেই। ঘরে ঢুকে দেখি, রাজা প্রতাপের জীবনীর বইটা টেবিলের পাশে পড়ে আছে। তার পাশে আরও একটা বই আছে। বঙ্গের আরেক রাজবংশের কথা। জল্লেশ শিবের অবতার রাজু পুথু, যিনি নালন্দা ধ্বংসকারী বখতিয়ার খিলজির বর্বর সেনাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। যিনি নরপিশাচ বখতিয়ারকে বাঁশপেটা করে বঙ্গে ছাড়া করেছিলেন। রাজা পুথু আর রাজা সন্ধ্যার রাজবংশের পরাক্রমে উত্তরবঙ্গ কোনোদিন বিধর্মীর সামনে মাথা নোয়ানি। বাঙ্গালি শুধুমাত্র ট্র্যাজিক হিরো নয়। সফল নায়কও বটে।

ওডোঙ্গায় না এলে জানতেই পারতাম না, আকাশে একসঙ্গে তিনটে রামধনু ওঠে।

With Best Compliments from -

**Ganpati Laminators
&
Packagers Pvt. Ltd.**

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—



Usha Kamal



ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের প্রাসঙ্গিকতা

ড: নারায়ণ চক্রবর্তী

ভা ভারতের কমিউনিস্টদের জন্ম হয় ১৯২০ সালে তাসখন্দে। ভারতের কমিউনিস্টদের জন্মলগ্ন থেকে তাদের কার্যপ্রণালী যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে অবশ্য এসব নিয়ে অবাক হওয়ার কারণ নেই। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে প্রথম Communist Party of India-র জন্ম হয়। এই সময় তাসখন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্টির ৭ জনের যে কোর কমিটি তৈরি হয়, তার প্রধান সংগঠক ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁর স্ত্রী ইভলিন রায়। সঙ্গে ছিলেন বেশ কিছু প্রাক্তন মুজাহিদ, যারা দেশ থেকে বাইরে গিয়ে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়। তারপর খিলাফত ব্যর্থ হওয়ায় লেনিনের বলশেভিক দলের সংস্পর্শে আসে। এদের

বিপ্রতীপে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা আমেরিকায় গঠন করেছিলেন গদর পার্টি। মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করলেও তিনি চেয়েছিলেন ভারতের অভ্যন্তরের বিপ্লবী গোষ্ঠী যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি থেকে যুবক ক্যাডার সংগ্রহ করতে। কিন্তু তিনি এই দুই সংগঠনের থেকে বিশেষ কাউকে টানতে পারেননি। ফলে প্রাক্তন মুজাহিদ মহম্মদ সফিক পার্টির প্রথম সেক্রেটারি হন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ এমপিটি আচারিয়া প্রথম চেয়ারম্যান হলেও এক বছরের মধ্যে এই মুজাহিদদের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দলের সংশ্রব ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে চলে যান। এই সময় প্রাক্তন মুজাহিদরা তাদের মজহবি প্রভুত্ব স্থাপনায় ব্যর্থ হওয়ায় দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে তাদের আশা পূরণের অভিলাষে এই দলে যোগদান করে। মহম্মদ সফিক ছাড়াও মহম্মদ আলি এবং আরও অনেক মুজাহিদ কমিউনিস্ট দলে যোগ দেয় এবং শুরু থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতার সুর চড়াতে থাকে তাদের মজহবি ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের স্বাধীনতার বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র জন্য নয়। ১৯২০-২১ সালে ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য করার যে ড্রাইভ নেওয়া হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই মুজাহিদরা মহম্মদ সফিক ও মহম্মদ আলির নেতৃত্বে। এখানে যে রেজোলিউশন নেওয়া হয়, সেখানে পরিষ্কার বলা হয় চীনা কুয়োমিনতাংয়ের আদর্শ এবং প্রয়োজনে যে কৌশল ভারতের পার্টির পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তা গ্রহণ করা হবে।

প্রাক্তন মুজাহিদদের একদল যেমন ভারতের কমিউনিস্টদের ড্রাইভিং সিটে বসল, তেমনি আরেক দল রাশিয়ার লেনিনের বলশেভিকদের কাছে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে গেলে—যার বড়ো অংশ পরবর্তী সময়ে ভাড়াটে বাহিনীতে নাম লেখালো। এই মুসলমানরা ভারত থেকে তাদের মজহবি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে তাদের সেই স্বপ্ন কমিউনিস্ট ভারত থেকে তাদের মজহবি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দিয়ে তাদের সেই স্বপ্নপূরণ করার জন্য এই দলের প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতে লাগল। তাসখন্দ মিলিটারি স্কুলে প্রাচ্যের অনেক প্রাক্তন মুজাহিদ যারা প্যান-ইসলামিজমের বাহক, তারা যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর আত্মজীবনী উৎসর্গ করেন দু’জন প্রাক্তন মুজাহিদ আবদুল মজিদ এবং ফিরোজউদ্দিন মনসুরের নামে। ১৯২১-২২ সাল থেকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হল মূলত মুজফ্ফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গ, সিঙ্গারাভেলু চেট্রিয়ার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তির পর।

পটভূমিকা জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পরবর্তী সময়ে এই কমিউনিস্ট পার্টি বারবার নীতির মোড়কে ব্যক্তিস্বার্থ ও নেতৃত্বের লিপ্সার কারণে বিভক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই প্রাক্তন মুজাহিদ

মহম্মদ সফিকের সময় থেকে যে প্যান-ইসলামিজমের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তলে এসেছিল, সেই মূল নীতি দেশের সব কমিউনিস্ট দলের আদর্শ হয়ে আছে। তারা শুধুমাত্র সর্বহারার কথা বললেও একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সকল ‘সর্বহারার’কে খুঁজে পায়। তারা ইসলাম মেনে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ পালন করে, ফলে আজ থেকে বহু বছর আগে তাদের ‘ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষতা’র বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের বহু কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ্যে যে গোরুর মাংস ভক্ষণ করে তা সংবাদমাধ্যমে প্রচার করে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভড়ং দেখান। অথচ, বহুবার চ্যালেঞ্জ করলেও মুসলমান কোনো কমিউনিস্ট নেতাকে কেউ শ্যোরের মাংস খেতে দেখেনি। সোহরির পর রোজা পালন না করে ইফতারে রোজা ভাঙার নাটক এদেশে প্রথম কমিউনিস্টরাই দেখায়। তারা পীঠ মন্দিরে মা কালীর কাছে পূজো দেওয়ার জন্য এ রাজ্যে এক কমিউনিস্ট মন্ত্রীকে তিরস্কার করা হলেও আরেক মন্ত্রীকে হজ পালনের জন্য কিছু বলাই হয় নি, পরন্তু তাঁর হজ যাত্রায় রাজ্য সরকার সহযোগিতা করে। কিছু উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন—বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, যিনি ৩৭ বছর কমিউনিস্ট পার্টির এমপি ছিলেন, একজন ঘোষিত হিন্দু-বিরোধী নেতা ছিলেন। এই লোকটি ৬২ বছর বয়সে আহম্মদ আলির তালাক দেওয়া বউ সুরাইয়াকে নিকাহ করেন এবং নিজের ধর্ম (যদি থাকত) ও নাম পরিবর্তন করে ইসলাম ‘কবুল’ করেন এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত থেকে হন ইমতিয়াজ গনি। তারপর, সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা পশ্চিমবঙ্গে ‘চাষার ব্যাটা’ রেজ্জাক মোল্লা বাম আমল থেকে তাঁর এলাকায় দায়িত্ব সহকারে হিন্দুদের জমি বর্গার নামে তাঁর মজহবের মানুষদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের নেতা হয়েছেন। শুধু এই কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তিনি কমিউনিস্টদের পরিত্যাগ করে শেষ বয়সে তৃণমূলের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ভারতে সব মুসলমান যেমন সুযোগ বুঝে কমিউনিস্ট হয়, তেমনি সব কমিউনিস্টের শেষ আশ্রয়স্থল হলো ইসলাম। এখানে কবি গোলাম মোস্তাফার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করি, ‘হিন্দু কমিউনিস্ট এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো ইসলাম।’ এভাবে তোষণ করতে করতে এবং নিজেদের ভারতীয় জাতিসত্তায় বিশ্বাস না রেখে এই দেশের কমিউনিস্টরা তাদের শিকড়কে উপড়ে ফেলেছে। নিজেদেরকে ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ হিসেবে না দেখার কারণে এরা নির্বোধের মতো কতগুলি মারাত্মক ভুল করে ফেলে। তারা মুজাহিদদের প্যান-ইসলামিজমে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম লিগের সহযোগী হিসেবে লিগের হিন্দু-বিরোধী আগ্রাসী নীতির অংশীদার হয়ে পড়ে। তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই-এর) জেনারেল সেক্রেটারি ড. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস, যা এখনও সিপিএম-সিপিআইয়ের আর্কাইভসে পাওয়া যাবে, সেই বইতে তিনি দাবি করেন যে, ভারত কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতির দেশ

নয়। ‘ভারতীয়’ বলে কোনো ন্যাশনালিটি বা জাতিসত্তা নেই। ভারত হলো ১৮টি পৃথক জাতিগোষ্ঠীর একটি সমষ্টি মাত্র। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্বতা থাকার দরুন স্বীয় পরিচয় বা জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা এবং জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ক্ষমতা, যোগ্যতা, শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনা অনুযায়ী নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজস্ব রাজ্য বা দেশ গঠন করতেই পারে। তার এই থিসিসের ভিত্তি ছিল জোসেফ স্টালিন রচিত ‘মার্ক্সিজম অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চন’

বইটি। ১৯৪২ সালে এই থিসিসটি রচিত হয়। এই সালেই গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদনা করেন ‘পাকিস্তান অ্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিটি’ বইটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরে সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে ‘অন পাকিস্তান অ্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিটি’-শীর্ষক একটি রেজোলিউশান পাশ করা হয়, ১৯৪৩ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে যার শিলমোহর পড়ে। অধিকারী রচিত এই থিসিস এবং কমিউনিস্ট পার্টির এই রেজোলিউশান যে ভারত ভেঙে ‘পাকিস্তান’ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সিপিআইয়ের আগাগোড়া দাবি ছিল যে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। ভারত বিভাজন ছাড়া ‘স্বাধীনতা’ সম্ভব নয়। জিন্মা ও মুসলিম লিগের ‘লাহোর প্রস্তাব’ অর্থাৎ পাকিস্তান দাবির সমর্থক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এইসব ভারত বিরোধী শক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী রক্তাক্ত বিভাজনের মাধ্যমে ভারত পেল খণ্ডিত স্বাধীনতা। ভারত বিভাজনের সময় উগ্র মজহবি কারণে পূর্ব ও পশ্চিমের পাকিস্তানি ভূখণ্ড তীব্র ইসলামি জাতীয়তাবাদের সূত্রে গাঁথা হলো। ভারত যা হিন্দুদের আবাসস্থল, তাঁদের পিতৃভূমি-মাতৃভূমি, তাকে সব উপাসনা পদ্ধতি, মত-পথের জন্য অব্যাহত দ্বার করে রেখে নেহরু চরম রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রশাসনিক গাফিলতিতে এবং প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক মদতে শুধুমাত্র মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার রাস্তা করে দিল।

এভাবে অযাচিত দাক্ষিণ্য ভারতের অভ্যন্তরে যেমন মজহবি মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল, তেমনি প্যান-ইসলামিজমের তত্ত্ব বৃক্কে বয়ে বেড়ানো জেহাদি ইসলামির সংখ্যাও বাড়তে লাগল।



কমিউনিস্ট পার্টির এক অদ্ভুত ধারণা জন্মালো যে, ভারতের অন্য সব দলের রাজনীতিকরা জাতীয়তাবোধের কথা মাথায় রেখে রাজনীতি করেন না। এই কথায় আংশিক সত্যতা পাওয়া যায় কমিউনিস্টরা ধীরে ধীরে তাদের প্যান-ইসলামি নীতির রূপায়ণের পক্ষে এগোতে লাগলো। মজহবি সুবিধে বাড়ানোর আন্দোলন, লাভ জিহাদ— ইত্যাদিতে কমিউনিস্টরা তাদের সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকে তোলা দিতে শুরু করল।

জোট রাজনীতির সময় এই কমিউনিস্টরা তাদের নীতির সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে তাদের

সমমনোভাবাপন্ন দলকে ভোট দিয়ে থাকে। আবার জাতপাত ও ধর্মনিরপেক্ষতার চক্রে নাজেহাল হিন্দুদের ভোট বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় তা ভোট রাজনীতিতে এক নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে যখন ভারতে কমিউনিস্টদের ভোট রাজনীতিতে প্রভাব, বিশেষত কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে বাড়তে লাগল, তখন ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস একটি বিশেষ পরিবারের রাজনৈতিক দলে পরিণত হলো। দশকের পর দশক ধরে ভারতের নানা ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচীর বিরোধিতা চালিয়ে গিয়েছে বামপন্থীরা। কিন্তু তারা ভারতের গতিরোধ করতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের ভারত বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও নেট দুনিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বের খবরাখবর পাওয়ায় কমিউনিস্টদের গোয়েবলসীয় প্রচারের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবোধ, যা সুভাষচন্দ্র বসু আনার চেষ্টা করলেও এক সময় জওহরলালের কংগ্রেসের দ্বিচারিতা ও ব্রিটিশ শাসকের নিপীড়নের ফলে হারিয়ে যায়। এই জাতীয়তার ধারণাই আবার ভারতীয় মননে জায়গা করে নিতে থাকে। ভারতীয় ভোটারদের মনে জাতীয়তার বোধ ও তার প্রয়োজনীয়তাকে ঘিরেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সজ্জ প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের পারস্পরিক নৈক্যটের সূচনা হয়।

এখানে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে হয়, যা কমিউনিস্টদের মুখোশ খুলে দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পক্ষ অবলম্বনকারী সব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বকে তারা বরাবর কুৎসিত আক্রমণ করে গেছে এবং এখনও করছে। তারা এভাবেই জাতীয়তাবোধের ভিত্তিকেই আঘাত হেনে নীতিগতভাবে নষ্ট করতে চেয়েছে। ডাক্তারজী যখন কলকাতায় ১৯২৮ সালে

কংগ্রেসের অধিবেশনে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসেবে এসেছিলেন, তখন সেবাদলের দায়িত্বে থাকা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা, আলাপ ও মত বিনিময় হয়। দুজনের জাতীয়তাবাদী চেতনাই তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে। এবং এই কারণেই ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার বিরোধী কমিউনিস্টরা পরবর্তী পর্যায়ে দুই শ্রদ্ধেয় নেতাকে যারপরনাই আক্রমণ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো নেতাকে ‘তোজোর কুকুর’, ‘কুইসলিং’ আখ্যা দিয়ে কমিউনিস্টরা তাদের ব্রিটিশ রাজশক্তির লেজুড় ও মুসলিম লিগের চামচা হিসেবে নিজেদের অবস্থানের প্রমাণ রাখে। নেতাজীর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা, এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে তাঁর লেখা কমিউনিস্টদের পছন্দ ছিল না। এমনকী সাভারকরের সঙ্গে নেতাজীর আলাপ এবং তাঁদের মধ্যে ১৯৪০ সালের ২২ জুনের সাভারকরের মুম্বইয়ের (তৎকালীন বোম্বে) বাড়ি সাভারকর সদনে যে আলোচনা হয়, তাকেও এই কমিউনিস্টরা বিকৃতভাবে প্রচার করে। সাভারকরের উপদেশ মেনে সুভাষচন্দ্র জানুয়ারি, ১৯৪১ সালে মহানিন্দ্রমণের পর জার্মানিতে সাহায্যের জন্য যান এবং তাঁরই পরামর্শে জাপানে গিয়ে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করে রাসবিহারীসৃষ্ট আইএনএ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ জন্যই নেতাজীকে কমিউনিস্টরা ‘তোজোর কুকুর’ বলত। এমনকী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধী এবং হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে থাকা সাভারকরকেও কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ‘সাম্প্রদায়িক’ এবং আরও নানা মিথ্যা প্রচারে হেয় করেছে। (Firstpost, Arun Anand, ২২ জানুয়ারি, ২০২২)।

কমিউনিস্টদের হিন্দুভোট ভাগ এবং মুসলমান ভোটব্যাংকের কৌশল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের কথা, বর্তমান ভারতে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষভাবে আঞ্চলিক দলগুলিতে জাতীয়তাবোধের অভাব অনুভূত হচ্ছে।

১৯৯২ সালে অযোধ্যায় পরিত্যক্ত, বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংস নিয়ে কমিউনিস্টরা পরবর্তী ৩০ বছর দেশের মুসলমানদের উত্তেজিত করে গেছে। অথচ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে যে শয়ে শয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা এবং হিন্দু-নিধন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো কমিউনিস্ট দল কোনো কথা বলেনি। তারা সকলেই এক গোষ্ঠীগত মানসিক বিকৃতিতে আক্রান্ত, যারা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বলতে শুধুমাত্র মুসলমান তোষণ বোঝে। তাই ইতিহাস বলছে, ভারতীয় কমিউনিস্টরা সর্বদা ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষী জেহাদিদের লেজুড়বৃত্তি করে চলেছে। এটাই এদের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় নীতি। কিছুদিন আগের সিপিএমের ব্রিগেড জমায়েতে ক্যাডারদের হাতে দেখা গিয়েছে হামাসের পতাকা বং তাদের অন্যতম স্লোগান ছিল, ‘মুসলমান বাঁচাও, বিজেপি হটাও’। সেখানে তাদের রাজ্য নেতৃত্বের শীর্ষ পদে আসীন মুসলমান নেতা

দলের হিন্দু কর্মী, যিনি মুর্শিদাবাদে জেহাদিদের হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় ঠিক করে বলতে পারেন না। এটি হিন্দু কমিউনিস্টদের জন্য এই দলের আন্তরিকতার অন্যতম নমুনা!

এবার আসা যাক সিপিএমের ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ‘ইন্ডিজোট’-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার অকথিত আসল কারণে। নির্বাচন কমিশনের যে দুটো ক্রাইটেরিয়া আছে তার মধ্যে যে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসেবে তারা যে সর্বভারতীয় দল থাকতে পারবে না, সেটা ‘ঘুরে দাঁড়ানো’র প্রবক্তারা নিজেরাও জানত। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য যে নীতিহীন জোট করে তাদের উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া, অর্থাৎ অন্ততপক্ষে তিনটি রাজ্যে যে তাদের আসন জেতার প্রেক্ষিতে উপস্থিতি থাকবে, সেই যুক্তিতে তারা সর্বভারতীয় দলের তকমা ধরে রাখতে সফল! আচ্ছা ভাবুন তো সিপিএম সবচেয়ে বেশি আসন কোন রাজ্যে পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালা বা বিহার নয়, তারা সবচেয়ে বেশি আসন জিতেছে তামিলনাড়ুতে। তাহলে কমরেডরা, হয়তো বলতে থাকবেন যে তাদের তামিলনাড়ুতে সংগঠনের ব্যাপক বিস্তার। এবারের নির্বাচনে এটা তাদের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য যার জন্য তারা লেজুড়বৃত্তি করে ইন্ডি নামের খিচুড়ি জোটে থাকার জন্য তামিলনাড়ুর বর্তমান শাসক দল ডিএমকে-র থেকে তাদের সহযোগী দল হিসেবে দুটি আসন লড়ার অনুমতি পায়। সেখানে যেহেতু ডিএমকে শতকরা ১০০ ভাগ আসনে তার দলকে জেতাতে পেরেছে, তাই এই আসন দুটিতে (দিন্দিগুলা ও মাদুরাই) ডিএমকে-র অনুগ্রহে সিপিএম জয় পেয়েছে। আবার কেরালায় তাদের রাজ্য সরকার থাকলেও সেখানে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে। কোনোক্রমে তারা একটি আসন (অলাথুর) পেয়েছে। এমনকী, ওই রাজ্যে বিজেপিও একটি আসন পেয়েছে। তাছাড়া, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থাকার কারণে তারা রাজস্থানে একটি আসনে (সীকর লোকসভা কেন্দ্রে) জিতেছে। অর্থাৎ সাকুল্যে এই ৪টি আসনে জিতে (লোকসভার মোট আসন ৫৪৩) তারা তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সার্থকতা প্রচার করেছে। এই নির্লজ্জতা শুধুমাত্র কমিউনিস্ট রাজনীতিক এবং লেফট ইকোসিস্টেমের সাংবাদিকদের থেকেই আশা করা যায়। এমনকী উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র এমন সাফল্যের মধ্যেও সিপিএমকে সপার ছেড়ে দেওয়া আসনে তারা জিততে ব্যর্থ— এই হচ্ছে কমিউনিস্টদের ঘুরে দাঁড়ানোর সাম্প্রতিক তত্ত্ব।

মোদা কথা হলো, এরা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এখন সতিই বেমানান। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের মিলিত ভোট ছিল ১৩.০২%; ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ৮.৬৯% এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ১০.৮৩%। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার, যেহেতু ২০২৪ সালে দু’দল (কংগ্রেস-কমিউনিস্ট) জোটবদ্ধভাবে লড়েছে, সেহেতু

তাদের আলাদাভাবে ভোট প্রাপ্তির শতকরা হিসাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুসলমান ভোটের প্যাটার্ন বলে দিচ্ছে, বাম-কংগ্রেস জোট এই রাজ্যে সেভাবে মুসলমান ভোট পায়নি। জোট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএমের ভোট কংগ্রেস প্রার্থী পেলেও, কংগ্রেসের ভোট কিন্তু সিপিএম প্রার্থীরা পায়নি। কংগ্রেসকে বুঝতে হবে, সিপিএম তথা কমিউনিস্টরা এখন জোটের রাজনীতিতে বোঝা। কারণ, শুরু থেকেই দেশ বিরোধিতা, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করা-সহ ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা বণ্ডার মতো ঘটনাগুলি কমিউনিস্টদের দেশের সংখ্যাধিক্য মানুষের কাছে বিরাগভাজন করেছে। এমনকী তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রচার মানুষের মনে দাগ কাটেনি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের সিপিএমের শাসনকে মানুষ ভোলেনি। এখন সিপিএমকে নিজেদের তামিলনাড়ুর দল বা কেরালা, রাজস্থানের দল না বলে

সর্বভারতীয়স্তরে দেশবিরোধী শক্তির লেজুড়বৃত্তি করেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। এই রাজ্যেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে তৃণমূলের লেজুড়বৃত্তি করতে হবে। বিরোধী দল সেজে থেকে এই রাজ্যে তারা 'ভোট কাটুয়া'র ভূমিকা পালন করবে। অবশ্য ভোটের ফল বেরোনোর পর 'গণশক্তি' ও 'জাগো বাংলা'র ছবি ও খবর দেখলে মনে হয় সে পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে।

উগ্র ইসলামি ভাবধারার বাহক হওয়ায় এই মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো দেশের থেকে তারা সমর্থন পেলেও তাদের মূল সমর্থনকারী বিদেশি শক্তি চীনের সুবিধার কথা ভেবে ভারতের বিরুদ্ধে সুব ইদানীং ক্রমশ নামাচ্ছে এই কমিউনিস্টরা। তার বড়ো কারণ হলো, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের 'ডিডলারাইজেশন' পদ্ধতি আমেরিকার বিরক্তির কারণ হওয়া এবং তাদের সংবাদমাধ্যমের তীব্র ভারত, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধিতা চীনকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এইসব কারণে সিপিএম এখন একটি 'কনফিউজড' রাজনৈতিক দল যার



রাজনৈতিক অস্তিত্ব অন্য দলের লেজুড়বৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

এই সিপিএমের সংসদীয় রাজনীতিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব না থাকলেও এই দলটি যেমন লেলিন-স্তালিনকে কবর খুঁড়ে টেনে আনে, তেমন কমিউনিস্ট শিক্ষায় শিক্ষিত রাজ্যের সাংবাদিকতায় ডিগ্রি পাওয়া সাংবাদিককুল তাদের সংবাদমাধ্যমের মালিকদের 'ডিপ স্টেট'-এর গুণগ্রাহিতার সুযোগে ভারতীয় রাজনীতিতে মৃত এই দলটিকে ভেন্টিলেশনে রেখে নানা প্রচার জারি রাখে। হয়তো মনে প্রচ্ছন্ন আশা, কোনো হেকিমি চিকিৎসায় ফ্ল্যাক্সেনস্টাইন আবার জেগে উঠবে। সর্বভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে এরা গুরুত্বহীন কেন, তা বলতে গেলে এদের সাম্প্রতিক ভোট রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হয়। এরা যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানে তাদের লোকসভায় আসন মাত্র একটি। পশ্চিমবঙ্গে পরপর কয়েকটি

নির্বাচনে বিধানসভা এবং লোকসভায় আসন সংখ্যা শূন্য। তারা রাজনৈতিক যুদ্ধে শূন্য থেকে মহাশূন্যে বিলীন হওয়ার পথে। তবু কীসের বাধ্যবাধকতায় তাদেরকে সংবাদমাধ্যম এত গুরুত্ব দেয়? সংবাদমাধ্যমের এই প্রবণতা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

অনেকে বলেন, এর জন্য ওই দল এবং তাদের আগের নেতারা দায়ী। এটা একদম ভাবের ঘরে চুরি করার মতো একটি কথা, যা একদম ঠিক নয়। এই বামপন্থী দলটির (অর্থাৎ সিপিএমের) যতই পরিবর্তন করা হোক না কেন, এ সব পরিবর্তন সর্বদা নতুন পাত্রের পুরোনো মদ পরিবেশনের মতো। তার কারণ হচ্ছে, দলটির ভারতীয় রাজনীতিতে জন্মের ইতিহাস এবং এই দেশের পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে নিজেদের নীতির পরিবর্তন না করা। এই যে দেশদ্রোহিতা ও নিজেদের ধ্বংসাত্মক নীতিতে অবিচল থাকা, এই রাজনৈতিক সততাই দলটিকে ভারতীয় রাজনীতিতে অপাণ্ড্রেন্স করে তুলেছে।

১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় যখন তার জেনারেল সেক্রেটারি হন ব্যর্থ খিলাফত

আন্দোলনের জেহাদি সৈনিক মহম্মদ সফিক, তখন থেকেই এই ভারতের কমিউনিস্টদের কাজের দিক নির্দেশ তারা (জেহাদিরা) ঠিক করে। তারা চিরকাল ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ থেকেছে, ‘ভারতীয় কমিউনিস্ট’ পার্টি হয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে ১৯৬২-তে ভারতকে চীনের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে চীনের সমর্থনে এগিয়ে এসে একদল কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) ভেঙে সিপিএম তৈরি করলেও তাদের ভারত ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ও জেনারেল সেক্রেটারি ড. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস এখনো সিপিএমের পার্টি অফিসে রেখে দেওয়া। তাদের মূল নীতি হলো, স্বাধীনতার পর ভারতকে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক না মনে করে শুধুমাত্র ভারতে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির ফেডারেল রিপাবলিক মনে করা। তাদের তদানীন্তন স্লোগান, “ইয়ে আজাদি বুটা হ্যায়, ভুলো মত্”— এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো, শক্তিশালী রাজ্য এবং দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি। যেটা হলে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতকে ভেঙে আরও টুকরো করা সহজ হতো। পাকিস্তান গঠন ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধাচরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত দেওয়া, চীনের সমস্ত ভারতবিরোধী পদক্ষেপের নিন্দা দূরের কথা, তার সঙ্গে সহমর্মিতা পোষণ করা, ভারতের যে কোন জাতীয়তাবাদী কাজের বিরোধিতা করা, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ প্রচারের মধ্যে দিয়ে মুসলমান তোষণনীতিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সব রকম মিথ্যাচার করা— এসব করতে করতে একসময় তারা ভারত বিরোধী বাইরের ও ভিতরের রাজনৈতিক শক্তিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে। যখন জনসাধারণ তাদের কথায় ও কাজে দ্বিচারিতা এবং দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা দেখল, তখন তারা আস্তে আস্তে ভোট রাজনীতিতে এই দলটিকে রাজনীতির আস্তাকুঁড়ে নিষ্ক্ষেপ করল।

এসব তো তাদের নীতির প্রশ্ন। কিন্তু, ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষী এই দলটির ইউএসপি-ই এখন এদের এই দেশে অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রধান অন্তরায় হলেও এরা খালি সেটিং, কানেকশান ও ইজমের সহমর্মিতাকে ব্যবহার করে ভারতীয় রাজনীতিতে টিকে রয়েছে। এক সময় সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, তাঁর যখন কোনো বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা বুঝতে অসুবিধা হতো, তখন তিনি স্টেটসম্যান কাগজ কী লিখেছে সেটা পড়তেন এবং ওই কাগজ যা বলছে, তিনি তার বিপরীত মত গ্রহণ করতেন। এভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের মানুষ এই কমিউনিস্টদের মতের বিপরীতে চলে বলেই এরা বর্তমানে পরজীবী রাজনীতি নির্ভর হচ্ছে। সে কারণেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের বছরখানেক আগে এরা আবার অজ্ঞাত জাদুস্পর্শে তেড়েফুঁড়ে জেগে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই বছর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এই দলটির রাজ্য সম্মেলনে কি ঘোড়ার মাথা না ঘোড়ার ডিম প্রস্তাব নেওয়া হলো, তা বহু প্রথমসারির

সংবাদমাধ্যম কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে বড়ো করে ‘সংবাদ’ করছে। সাম্প্রতিক অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে শূন্য পাওয়া এই দলের প্রচারের উদ্দেশ্য একটাই। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে এরা প্রভূত সাহায্য করছে এবং করবে।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে মিথ্যাচার ও দ্বিচারিতা ছাড়াও এদের সব নাটকের পিছনের অঙ্ক ধরে ফেলা যায়। আগামী নির্বাচনেও একই নাটক অনুষ্ঠিত হবে, শুধুমাত্র নতুন বোতলে পুরোনো মদ পরিবেশনের মত করে।

এই দলের দ্বিচারিতার আরও একটি উদাহরণ হল, দিল্লিতে আপের বিজেপির কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর এদের দলীয় দৈনিকে এরা লিখেছে যে, কংগ্রেস নাকি দিল্লিতে প্রার্থী দেওয়ায় ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে আপ (আম আদমি পার্টি) বিজেপির কাছে হেরেছে। এ একদিকে যেমন ভাবের ঘরে চুরি, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এক যুক্তি করে দিল্লিতে বিপরীত যুক্তি। যদিও কংগ্রেসের নিজস্ব ভোটের সব ভোট আপে যায়, তাহলেও দিল্লিতে বিজেপির জিততে অসুবিধা হয় না। অন্তত অঙ্ক তাই বলে। আর দিল্লিতে একদা যে দল থেকে টানা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল, সেই সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস সেখানে আপের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেখানে দলকে আপের কাছে বন্ধক রাখবে, ভোটে আপের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না। তাহলে একই যুক্তিতে সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ইন্ডিজোট-সঙ্গী তৃণমূলকে সমর্থন করার কথা। তখন তারা কেন প্রার্থী দিচ্ছে? কারণ, তৃণমূল-বিরোধী ভোট বিভাজনের ফলে বিজেপির ক্ষতি আর তৃণমূলের লাভ। তাহলে, মহাশূন্যে অবস্থান করা সিপিএম কাদের জন্য, কাদের দৌলতে, কাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ছে? এখানেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকদের বুঝতে হবে নিজেদের সুরক্ষা এবং রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কাকে ভোট দেবেন আর কোন ভোটকাটুয়াকে পরিত্যাগ করবেন। তাদের পরিপক্বতার উপর নির্ভর করবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ।

১৯২০ সালে তাসখান্দে জন্ম হওয়া ভারতের কমিউনিস্ট দল এবং বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বের স্বার্থের প্রয়োজনে তার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা কমিউনিস্ট দলগুলি একক বা সংঘবদ্ধভাবে কখনো দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, জন্মের একশো বছরের মধ্যেই প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক দলগুলির আনুকূল্য না পেলে তারা সর্বভারতীয় দলের তকমাটাও হারাবে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে হয়, তা হলো, ভারতের স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে যে রাজনৈতিক সাফল্য পেয়েছিল, তা নিজেরাই নষ্ট করেছে নেগেটিভ রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে।

যখন দেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল, তখন তারা সেই আন্দোলনের বিপরীত দিকে গিয়ে ব্রিটিশ

রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের বদলে গরিব, সর্বহারার নামে সাম্প্রদায়িক, হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলিম লিগকে শর্তহীন সমর্থন দিতে শুরু করল। সেই প্রথম তারা দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সরাসরি বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে চাইল। পরাধীন দেশে যত মুসলিম লিগের আগ্রাসন বাড়তে থাকে, কমিউনিস্টরাও ততই লিগের সমর্থনে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসে। এমনকী, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের মুসলিম লিগের ডাকা ডাইরেক্ট অ্যাকশানের মিটিংয়ে, যেখান থেকে সুরাবর্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনরা সরাসরি হিন্দু নিধনের ডাক দিয়েছিল, সেই মিটিংয়ে সহযোগী দল কমিউনিস্ট পার্টি শুধু যোগই দেয়নি, তাদের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু সেদিন অক্টারলোনি মনুমেন্টের নীচে মঞ্চ

আলো করে এই লিগ নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল— আগে পাকিস্তান গঠনের পর তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে, তারপর আসবে অবশিষ্ট খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন। তারা মুসলিম লিগের সঙ্গে মিছিলে গলা মিলিয়ে নারা লাগাত—“লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান”। এমনকী স্বাধীনতার পরে দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে তারা স্লোগান তুলত, “ইয়ে আজাদি বুটা হ্যায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্”।

তারপর এল ১৯৬২-র চীনা আগ্রসন। সে সময় সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাফালাফি চলছে। এই আগ্রাসনের প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম বড়ো ভাঙন দেখা দিল। এর প্রধান কারণ নেতৃত্বের সংঘাত। যেহেতু দলটি তার জন্মের শুরু থেকেই দ্বিচারিতাকে দলের বাড়বাড়ন্তের মূল রাস্তা বানাতে চেয়েছে, সেহেতু নিজেদের দেশের স্বার্থে চীন একদল নেতৃত্বলোভী কমিউনিস্টদের মগজ খোলাই করিয়ে তাদের দিয়ে খোলা বিবৃতি দেওয়ালো যে, চীন ভারতকে নয়, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে। অবাস্তবকে সত্যি বলে চালানোর গোয়বলসীয় প্রচারের ফলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা দু'ভাগ হয়ে গেল। জ্যোতি বসু, মুজফ্ফর আহমেদের মত নেতারা কিছুদিন সীমানায় বসে জল মেপে দেখলেন দ্বিতীয় দল ভারী হচ্ছে, তখন তারা এই দলে ভিড়ে গেলেন। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বে সিপিআই এবং হরকিষণ সিংহ সুরজিৎ, জ্যোতি বসুদের নেতৃত্বে



“চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান” ও “ধনীর গায়ের চামড়া দিয়ে গরিবের পায়ের জুতো তৈরি হবে”। দুর্ভাগ্য আমাদের! যারা গরিব, সর্বহারার কথা বলে, তারাই সর্বহারার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য সর্বহারাকে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপনে বাধ্য করে। প্রথম স্লোগানটি সরাসরি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিরোধী। দ্বিতীয়টি কালচারাল মার্ক্সবাদ ও মাওবাদজাত অতিবামপন্থী। রাশিয়ার ‘সোভিয়েত রাশিয়া’ হয়ে ওঠার জন্য যে শোষণ, পীড়ন এবং উগ্র সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত হয়েছিল, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের জাতীয়তাবোধ সেই সোভিয়েতের পতনের কারণ হলো। চীন তার জাতীয় স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলকে মদত ও তোলা দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিরোধী দলে পরিণত করল। আর এই কমিউনিস্টরাও চীনের ফাঁদে ধরা দিল। যদিও এ দেশের কমিউনিস্টরা সর্বদা সর্বহারার কথা বলে, কিন্তু তারা ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমানদের সম্প্রদায়গতভাবে গরিব, সর্বহারা এবং হিন্দুদের সম্প্রদায়গতভাবে বুর্জোয়া ছাপ দিয়ে হিন্দু-নিধনে তোলা দেয়। ১৯৪৬-এ ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্’-এর সময় মেটিয়াবুরুজে যে দু’শতাধিক হিন্দু দিন-মজুর ও শ্রমিকদের শুধু হিন্দু হওয়ার ‘অপরাধে’ হত্যা করা হয়, সে বিষয়ে ভারতের কোনো কমিউনিস্ট দল একটি কথাও খরচ করেনি।

এই কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক ভুলের

কারণে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। তখন পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কারণে এই উদ্বাস্তুদের কাছে কমিউনিস্টরা কপট সমব্যথীর মতো আচরণ করে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়। এভাবে এই তিন রাজ্যে তাদের ভোট বাস্তব স্ফীত হয়— বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। কিছু ক্ষেত্রে এদেরকে দলীয় সংগঠনে তারা যুক্ত করে নেয়। তারপর মূলত এদের ভোটের দৌলতে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা বিশেষত সিপিএম গরিবের অন্ন, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বারোটা বাজিয়ে দেয় হিংস্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাড়বাড়ন্ত করতে গিয়ে। শিক্ষায় দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রশাসনিক মদতে শিক্ষার উৎকর্ষতা নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ বিঘিয়ে দেয় কমিউনিস্টরা। অর্থনীতির সকলক্ষেত্রে এবং শিক্ষায় কমিউনিস্ট রেজিমেন্টেশন প্রতিষ্ঠিত হলো। অন্যদিকে ভূমি-সংস্কারের নামে সব বড়ো জমির মালিকদের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে অসংখ্য দলীয় আনুগত্যে থাকা পেটি-বুর্জোয়া তৈরি হলো। এর দুটি অত্যন্ত খারাপ fall out হলো— ছোট জমিতে ভবিষ্যতের আধুনিক চাষবাসের পদ্ধতির প্রয়োগে অসুবিধা; দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের জমি কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার কারণে গ্রামবাসীরা জনবিন্যাসে আমূল পরিবর্তন। এই সময় থেকেই দলীয় সমর্থনে পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার চোখ বন্ধ করে থাকে। এই বিদেশি মুসলমানদের ভারতীয় রেশন কার্ড এবং পরবর্তীতে ভোটার কার্ড তৈরিতে রাজ্যের শাসক দল সিপিএম এবং বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট সাহায্য করে। এদের সবাই হলো বাংলাদেশের নাগরিক এবং রোহিঙ্গা মুসলমান। এদের এই পশ্চিমবঙ্গে থাকতে সাহায্য করে কমিউনিস্টরা শুধু ভারতীয় হিন্দুই নয়, দেশীয় মুসলমানদের পর্যন্ত ক্ষতি করেছে। এই কারণেই দেশীয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এনআরসি কার্যকর করার আশু প্রয়োজন। পরবর্তী পর্যায়ে গোটা দেশে এই ব্যবস্থা বলবৎ করা দরকার। মনে রাখতে হবে, ‘সিটিজেনশিপ কার্ড’ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় দেশে আছে। তবে ভারতের নাগরিকদের সুবিধার জন্য এই নাগরিকত্বের কার্ডের ব্যাপারে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের আপত্তি কেন? এদিকে বাম আমলে শ্রমিক ও কৃষকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান তো দূরের কথা, তাদের দলীয় ক্যাডারে পরিণত করে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধি এবং ভোটের সময় জাল, জোচ্চুরি, ছাণ্ডা ভোট ও নির্বাচনী হিংসার কাজে লাগানো শুরু হলো খুব সুচারুরূপে। এতে মানুষের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ সংকুচিত হল। এর অবিসংবাদী ফল হিসেবে বামফ্রন্টের বকলমে সিপিএমের শাসন মানতে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাধ্য হলো। একের পর এক নির্বাচনে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জয়ী হতে থাকলো বামফ্রন্ট। এই কমিউনিস্টরা

কয়েকটি ক্ষেত্রে কখনো তাদের লাইন পালটায়নি। প্রথমত, তারা যেকোনো ভারত-বিরোধী ঘটনা ও কাজে উৎসাহ বোধ করে। দ্বিতীয়ত, শুধু এই উপমহাদেশেই নয়, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে সব জায়গায় জেহাদিদের সমর্থন করে। এমনকী সম্প্রতি ইজরায়েল বনাম হামাস সংঘর্ষে তারা খোলাখুলি হামাসকে সমর্থন করেছে। সেখানেও অবশ্য তারা তাদের দ্বিচারিতা ও মিথ্যাচার বজায় রেখেছে। তারা হামাসকে ‘প্যালেস্তাইন’ বলে চালাতে চাইছে। অথচ ঘটনা হচ্ছে, হামাসের সঙ্গে প্যালেস্তাইনের ফাতাহর সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়।

কমিউনিস্ট শাসনের দ্বিচারিতায় দেখা যায় উদ্বাস্তু মেরে উদ্বাস্তু প্রেম। মরিচকাঁপিতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে গণহত্যা এবং বালিগঞ্জে বিজন সেতুর উপর পূর্বপরিকল্পিত হামলায় আনন্দমাগী অবধূতদের নৃশংস হত্যার মতো ঘটনা উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে ক্রমশ কমিউনিস্ট শাসকদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। যাই হোক, এটা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সৃষ্টি হওয়ার পর এই রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের যে নজর ও সাহায্য দেওয়ার দরকার ছিল, তা জওহরলাল নেহরু ও তার পরবর্তী কংগ্রেস সরকারের থেকে কখনোই পাওয়া যায়নি। উপরন্তু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিজমের নামে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় অস্মিতা যাতে যুবমানসে তৈরি না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে এই রাজ্যে জেহাদি মদত এবং হিন্দুত্বের বিরোধিতার চাষ করা হয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম, হিন্দুদের পূজার্চনা, হিন্দু দেবদেবীকে বিদ্রূপ করাকেই আধুনিকতার মাপকাঠি মানা হয়েছে। ‘রোটি, কাপড়া অউর মকান’ স্লোগান যখন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করল, তখন কমিউনিস্টদের এই “ভাত দে”, “শিক্ষা দে’র ধ্যাত্মমো ধীরে ধীরে রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ব্রিগেডে সিপিএম-এর যুব সংগঠন যেসব জমায়েত করে, সেখানে আবার ভাত দে, চাকরি দে-র ভড়ং শুরু করে। এরা কখনো বিকল্প পজিটিভ চিন্তাধারার প্রকল্প মানুষের সামনে তুলে ধরে না। অতুল্য ঘোষের চোখের সমস্যাকে কুৎসিতভাবে ‘কানা অতুল্য’ বলে তুলে ধরা; ইন্দিরা গান্ধীর কার্টুনে নখ, দাঁত থেকে রক্ত ঝরা ডাইনির রূপ দেওয়া; রাজীব গান্ধীকে বোফার্স গান্ধী বলে সম্বোধন করা হয়তো বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্মৃত হয়েছে। তবে বাঙ্গালি এখনো এসব ভোলেনি। ১৯৪৬-এ ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের সময় মুসলিম লিগের ‘ইস্রাফ’ চাওয়াকে সমর্থনকারী কমিউনিস্টদের বর্তমান ব্রিগেড ফের ‘ইস্রাফ’ চাওয়াকে মনে করচ্ছে। সে সময় মুসলিম লিগের ইস্রাফ ছিল কার বিরুদ্ধে? ইংরেজ শাসক তাদের আলাদা দেশ হিসেবে স্বাধীনতা দিতে রাজি। কংগ্রেসও দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। তাহলে এই ইস্রাফের নামে

মুসলিম লিগ ও তাদের সহযোগী কমিউনিস্টদের ইন্সার কার বিরুদ্ধে ছিল তা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। নির্বিচারে হিন্দু হত্যাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যা ইউরোপীয় সাংবাদিকের লেখায় অঙ্গি উল্লেখিত। তাই ভয় হয় আবার ‘ইন্সার’-এর নামে এরা কী চাইছে?

এখন কমিউনিস্ট শাসনের উন্নততর সংস্করণ হলো তৃণমূলি শাসন, যা রাজ্যের মানুষের প্রতিবাদের অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে— প্রতিরোধ তো দূরের কথা। এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৮৯ থেকে ২০১৪-১৫-র কাশ্মীরের কথা। সে রাজ্যের মতো এ রাজ্যও ইসলামি দেশের সঙ্গে বিস্তৃত খোলা সীমান্ত রয়েছে। এ রাজ্যের সঙ্গে যে সীমান্ত রয়েছে তা এতদিন ছিল রাজনৈতিকভাবে অনুকূল পরিবেশে। কিন্তু গত বছর বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারকে জেহাদি অভ্যুত্থানের দ্বারা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাচ্যুত করে, আর্থিক ও লজিস্টিক সাহায্যের মাধ্যমে ভারত-বিদ্রোহী মহম্মদ ইউনুসকে ক্ষমতায় বসিয়েছে গ্লোবাল ডিপ স্টেট। বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেখানে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু-বিতাড়ন পর্ব শুরু হলেও ভারতের কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। কারণ ওই একটাই। সেই মহম্মদ সফিকের সময় থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক লাইন হলো, তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষ এবং

ভারতের ক্ষতি ও পাকিস্তানকে মদত।

গত ২২ এপ্রিল ঘটে যায় পহেলগাঁও কাণ্ড। সেখানে যখন ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে পাকিস্তানি লস্কর জঙ্গি এবং তাদের কাশ্মীরি সঙ্গীদের দ্বারা নিহত হতে হয়, সে সময় পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলে বসে একজন পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞ উদ্ভূত বলেছিলেন, কাশ্মীরিয়তের এবং ৩৭০ ধারার প্রক্ষেপে পাকিস্তানের সঙ্গে অনেক ভারতীয় আছেন, যেমন অরুন্ধতী রায়, মমতা ব্যানার্জি। এরই সঙ্গে তিনি কংগ্রেস দল এবং ভারতের কমিউনিস্টদের নাম বলেছিলেন। কনসার্টেড মিথ্যাচার ও দেশদ্রোহিতার সঙ্গে এরা যে ইসলামি জঙ্গিদের গেস্টাপো বাহিনী হিসেবে এখনো কাজ করে চলেছে, তা দেশের ১৪০ কোটি মানুষের কাছে পরিষ্কার।

ছোটবেলায় শোনা একটি স্লোগান মনে পড়ে গেল, ‘চীনের কাস্তে-হাতুড়ি, পাকিস্তানের তারা, এখনো কি বলতে হবে দেশের শত্রু কারা’। কমিউনিস্টদের থেকে দেশকে মুক্ত করার সুহার্তো দাওয়াই আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার স্থিরতা ফিরিয়ে এনেছিল। সেটিই কমিউনিস্টদের জন্য সঠিক দাওয়াই। কমিউনিস্ট-মুক্ত ভারত না হলে জেহাদি ও পাকিস্তানপন্থী ‘ফিফথ্ কলাম’ বা পঞ্চম বাহিনী দেশকে কখনো সুস্থ থাকতে দেবে না। এদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচার শুনে স্বয়ং গোয়েবলস পর্যন্ত কবরে পাশ ফিরে শুয়েছেন।

With Best Compliments From -



**Willowood Chemicals
Limited**

With Best Compliments
from -



A
Well Wisher



গল্প

গৌরব

গার্গী দেব

জ্যৈষ্ঠের ভরা দ্বিপ্রহর। গনগনে রোদ যেন আগুনের ভাটা। অ্যাসবেস্টাসের চারচালা ছোট্ট বাড়িটার পাশে উঠানে আমগাছটার ছায়ায় বসে রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছিল বুথিয়া সোরেন। রাজমিস্ত্রিরা একের পর এক কেমন ইটগুলো গাঁথছে, আবার ওলোন ঝুলিয়ে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে ঠিক সোজা হচ্ছে কিনা। ইট তো গাঁথছে না, যেন স্বপ্নের ইমারত গাঁথছে। সবই তো ওই একমাত্র খোকাটাই যা করছে। না হলে বুথিয়ার কি সাধ্য ছিল রাজমিস্ত্রি লাগায়? মাটির বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দুঃখে বুথিয়ার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। অ্যাসবেস্টাস তো সেদিন হলো। এর আগে তো ছিল দরমার বেড়া দেওয়া খড়ের ছাউনি। আহা! দীর্ঘ তিরিশ বছর ওই

দীনহীন বাড়িই তিনটে প্রাণীকে আশ্রয় জুগিয়েছে গ্রীষ্মে-বর্ষায়। আজই না হয় ইমারতের স্বপ্ন দেখছে, কোঠাবাড়ির আশা করেছে সে। ওর তিনকুলে কেউ ভাবতে পেরেছিল কি? সাহস ছিল কি তাদের?

রাজমিস্ত্রিরা বিশ্রাম করতে করতে চলতি হিন্দি গানের সুর ভাঁজতে থাকে। এরমধ্যেই বেশ অনেকটা গাঁথা হয়ে গেছে ওদের। রাজমিস্ত্রিদের হাতের প্রশংসা করতে হয় বটে। নিজের শিরা ওঠা দুই শীর্ণ হাত দুটো মেলে পরখ করে বুখিয়া। হায় রে, খেটে খাওয়া মানুষের হাত তো এমনই হয়—রক্ষ, কর্কশ, চামড়া ওঠা। এই হাতেই তো লাঙল, বলদ, কোদালে জমি কুপিয়েছে। মসৃণ হাতের স্বপ্ন দেখাও যেন ওদের পাপ। মাটির গল্প ওদের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে।

দুপুরের রক্ষ বাতাসে উড়ছে লালমাটির ধুলো, গাছের শুকনো পাতা। অনেক দূরে একটা কাঁঠালগাছের ডালে বসে একটা দাঁড়কাক একটানা কা-কা করে ডেকে যাচ্ছে।

বুখিয়ার মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে। দীর্ঘ তিরিশটা বছর ভুবন দাসের জমিতে চাষ করেছে সে। বাবুলোক খারাপ নয়, টাকাপয়সা, ভাগের ধান মোটামুটি দিয়ে এসেছে। তাতেই পেটগুলো কোনোরকমে চলত। গরিবের ঘরে চাঁদপানা খোকাটা এসেছিল। সবাই বলত—রাজপুতুর। ছোটবেলা থেকে একরত্তি ছেলেটার কী বুদ্ধি, কী সাহস! ছোটো ছোটো হাত দুটো যতটা পারে বিস্তৃত করে বলত—‘দেখবে, এই এত্তবড়ো বাঘ আমি তোমাদের ধরে এনে দেব।’ শুনে সকলের কী হাসি। মনে করে বুখিয়ারও ষাট বছরের ফোকলা মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সেসব কত কালের কথা।

গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার যতীনবাবু বলেছিলেন—‘ছেলেকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করে দে। বড়ো হয়ে ভবিষ্যতে তোদের নাম রাখবে।’

কস্টে-সুস্টে মাস্টারমশায়ের হাতেই ছেলেকে তুলে দেয় সে। মাস্টারমশাই-ই নাম রাখেন, গৌরব সোরেন। জীবনে স্কুলের কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় না হয়ে নামের মর্যাদা রেখেছিল সে। গৌরব, বুখিয়ার গৌরব, গোটা গ্রামের গৌরব। একের পর এক পরীক্ষায়

সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শেষে সরকারি পরীক্ষায় পাশ করে শহরে নামকরা স্কুলে গণিতের শিক্ষক রূপে যোগদান করে। আর সেটাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত। আদর্শ শিক্ষক রূপে ছাত্রদের পড়ানো, সমাজ গড়া।

মাত্র পাঁচবছরেই গৌরব সোরেন দারুণ জনপ্রিয়, খুব প্রিয় ছাত্রদের কাছে, সহকর্মীদের কাছে। তার পড়ানোর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

রাতে খেতে বসে গৌরবই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে—‘বাবা, অনেক কষ্ট করেছে। আর কেন? পুরানো দেওয়াল খসে পড়ছে। মাটির মেঝেতে ইঁদুর গর্ত করছে। এসব ছাড়া। আমি তোমাকে নতুন পাকাবাড়ি তৈরি করে দেব।’ খুশিতে বুখিয়ার দু’চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—‘সত্যি খোকা? সত্যি বলছিস, আমাকে বাড়ি বানিয়ে দিবি?’ পরে অস্পষ্ট স্বরে বেদনার সঙ্গে বলতে থাকে—‘আমার যে অনেকদিনের স্বপ্ন, খোকা। বুড়া মা-রে এবার আমি দ্যাশ খেকে লিয়া আসব। নিজের ঘরে রাখব। তুই আর দেরি করিস না রে খোকা। তবে চালাঘরটা আমার তরে রাখিস।’

ইচ্ছেটা গৌরবের মনে অনেকদিনই ছিল, এখন তাগিদটা আরও জোরালো হয়ে উঠল। স্কুলের বেতন ভালো থাকায় ব্যাংকের লোন পাওয়াও সহজ হলো। তাদের পাঁচকাঠা জমির মধ্যে তিনকাঠার ছোট সুন্দর একটা বাড়ির প্ল্যান সরকারি অনুমোদন পেয়ে গেল। সবই বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। শুভদিনে ভিতপূজা সেরে বাড়ি শুরু হয়ে গেল। সামনের বর্ষা আসার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়তে হবে, নাহলে ও বাড়ির যা অবস্থা, বৃষ্টির তোড়ে ভেঙে না পড়ে।

—‘ও দাদু, পাঁচটা বাজল। আমাদের ডিউটি খতম। এবার আমরা বাড়ি যাচ্ছি। বাবুকে বলবেন, কাল দশ বস্তা সিমেন্ট লাগবে, আর স্টোনচিপস্ তিন বস্তা।’ শিস্ দিতে দিতে সাইকেল নিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়।

পাড়ার বন্ধু হারান মণ্ডল রায়পুকুরের দিকে গামছা কাঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল। বুখিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।—‘বেশ রে বুধো, দারুণ বাড়ি তুলছিস, ভাগ্যটা তোর খুব ভালো, ভোগ কর রে বুধো, ভোগ করে নে।’

—‘আমার কোনো যশ নাই রে হারান। সবই ওই খোকা।’

—‘সত্যিই তুই সোনার বেটা পেয়েছিস রে বুখিয়া।’

স্কুলে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা চলছে। গৌরব অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই স্কুলে পৌছাল। ত্বরিত হাতে প্রশ্নপত্র আর উত্তরপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল। ক্লাস ফোর স্টাফ বরণ এসে বলল—‘গৌরববাবু, হেড মাস্টারমশাই আপনাকে তাঁর ঘরে দেখা করতে বলছেন।’ কিন্তু, পরীক্ষা শুরু হতে তো বেশি বাকি নেই। চিন্তিত মনে গৌরব একতলার দিকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।—‘আসব স্যার? আমায় ডেকেছেন?’ গৌরবের দিকে একপলক তাকিয়ে হেডস্যার নীরবে একটা খাম তার দিকে এগিয়ে দেন।—‘কী আছে এতে?’ গৌরব কৌতূহল প্রকাশ করে।—‘তুমিই দেখ, গৌরব। আই অ্যাম ভেরি সরি।’ কী এক যেন অশনিসংকেতে ওর মনটা কেঁপে উঠল। নিমেষে খামটা খুলে পড়তে লাগল—‘Regret to inform you that you are suspended from you job as per Court order till further procedure....’

একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গৌরবের পায়ের তলাটা যেন দুলে উঠল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে ধপ্ করে সামনের চেয়ারের উপর বসে পড়ল সে, বাস্পরুদ্ধ হতাশ কর্তে উচ্চারণ করল—‘কিন্তু, কেন স্যার? আমার কী দোষ? আমি তো পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেই চাকরি পেয়েছি, আমি....’

বাকি কথাগুলো সে উচ্চারণ করতে পারে না। গলার কাছে একটা দলা পাকানো কান্না তার কর্ণ রুদ্ধ করে দেয়। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে ধূসর মাঠটার দিকে। ফ্ল্যাশব্যাকের মতো একের পর এক অপস্রিয়মাণ—ব্যাংকে তার হোম লোন, লিটেল পর্যন্ত ঢালাই করা তার নতুন বাড়ি আর বুখিয়া সোরেনের নতুন বাড়ির জন্য স্বপ্নভরা দুটো উজ্জ্বল চোখ।—‘খোকা, সত্যিই তুই নতুন বাড়ি বানিয়ে দিবি? খোকা, তুই যে আমাদের গৌরব!’ □